দাম : ষোলো টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ
— পৃঃ ১৯

স্বস্তিকা

হিন্দুদের লড়াইটা এখন জাত ধর্ম বাঁচানোর
— পৃঃ ১১

৭৭ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা।। ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫।। ২৮ পৌষ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা, ২৮ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৩ জানুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

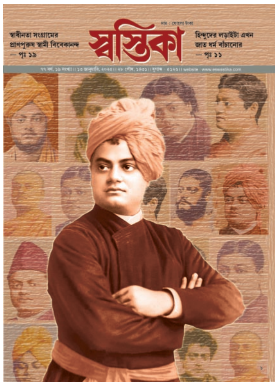

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সিপিএমের পতন নিশ্চিত করেছিল নিঃশব্দ পুলিশ বিদ্রোহ

সরছে পুলিশ কাঁপছে মমতা ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ছদ্ম লড়াইয়ের শেষে, আমে দুধে মিশে!

◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারত সংস্কৃতির বিরাট দর্শন কুম্ভমেলা

◻ **গুঞ্জন আগরওয়াল** ◻ ৮

হিন্দুশূন্য করতে গিয়েই বাংলাদেশ শেষ হতে চলেছে

◻ **সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী** ◻ ১০

হিন্দুদের লড়াইটা এখন জাত ধর্ম বাঁচানোর

◻ বটুকৃষ্ণ হালদার ◻ ১১

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিবেকসম্পন্ন মানুষদেরই রাজনীতিতে আসা প্রয়োজন ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ১৩

কয়েক শতাব্দীর এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

◻ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৭

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ

◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ১৯

প্রয়াগের মহাকুম্ভে নাগা সাধুর সন্ধানে

◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৩১

ধর্মান্ধতা রুখতে স্বামীজীর দর্শনই একমাত্র পথ

◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩৫

সততার ধ্বজাধারী কমিউনিস্টরা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে জড়িত

◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ৩৭

দুই মহাসন্ধিক্ষণে ভাবসমন্বয়ের বার্তাবাহক তথাগত বুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ ◻ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৪৩

প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিদেশনীতির পর্যালোচনা

◻ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮** ◻ **রঙ্গম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০**

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২০ জানুয়ারি
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২০ জানুয়ারি
২০২৫

দেশপ্রেমিক নেতাজী

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য তিনি। তিনি না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এত সহজে ভারত ত্যাগ করত না। একথা এক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীই স্বীকার করেছেন। দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্যই তিনি দেশান্তরি হন। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতালোভী নেতারা তাঁর দেশপ্রেমকে সহ্য করতে পারেননি। তাঁর নামে নানান কুৎসা রটনা করা এমনকী তাঁকে বিভিন্নভাবে অপমান করা হয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় নেতাজীর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে তাঁর জীবন ও দেশপ্রেমের ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০ + ৩৬০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০ + ৮৫০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিবেকবোধ

দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনের মূল ভিত্তি হইল 'বিবেকবোধ'। ধর্ম সংকটাপন্ন হইলে, সমাজে গ্লানি বৃদ্ধি পাইলে দেশ ও জাতি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া থাকে। রাষ্ট্রচেতনা হয় বিপন্ন। ইহার মূলে রহিয়াছে সমাজ হইতে বিবেকবোধের বিলুপ্তি। ধর্ম-অধর্ম, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, নীতিবোধ-নীতিহীনতা, মূল্যবোধ-মূল্যবোধহীনতার ন্যায় চেতনাসমূহ একত্রে মানবজাতির বিবেকবোধের চিরন্তন রূপটি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সকল শুভ চেতনা ও মানসিকতার এই সার্বিক রূপকল্পটি ধর্মের বিকাশে এবং মানবজাতির চতুর্বর্গফল লাভের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক শক্তি। বস্তুজগতে বিরাজমান মনুষ্যের আর্থিক ও পারমার্থিক উত্তরণের মূল সোপান হইল বিবেকবোধ। আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল নিয়ন্ত্রক হইল বিবেকবোধ। একমাত্র বিবেকবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম। ভালো-মন্দের তুলনামূলক বিচারে বিবেকহীনগণ অপারগ। বিবেকবোধরহিত সমাজ ও জাতির ভবিতব্য হইল সমূলে পতন।

যুগে যুগে মহামানবগণ মানব সভ্যতার মূলকেন্দ্র ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই পবিত্রভূমিকে ধর্মবোধের জোয়ারে প্লাবিত করিয়াছেন। সমগ্র সৃষ্টি রক্ষার্থে তাঁহারা সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। অনাগত প্রজন্মের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সাধনা। মহামানবগণ প্রদত্ত বাণী ও উপদেশাবলীকে পাথেয় করিয়া ব্রহ্মপদানুসন্ধানী হইয়াছে সাধারণ মানুষ। 'শরণাগতি' হইয়া উঠিয়াছে দিব্যজীবন লাভের অন্যতম মূলমন্ত্র। মহামানবগণের বাণী অনুধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের বরেণ্য ভক্ত ও শিষ্যগণও সমাজে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রচারিত হইয়াছে মহামানবগণের নির্দেশাবলী এবং সেই সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যাখ্যা। ইহার পরিণামে বারংবার সমাজ জীবন হইতে লুপ্ত বিবেকবোধ স্বস্থানে হইয়াছে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, গ্লানিমুক্ত হইয়াছে জাতি, রাষ্ট্রীয়তার চেতনা হইয়াছে সুদৃঢ়, হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছে দেশ। বিবেকবোধ জাগরণের দরুন ধর্ম-সম্পর্কিত সত্যাসত্য নিরূপণে পারঙ্গম হইয়াছে জাতি, তাহার মেরুদণ্ড হইয়াছে শক্ত। এই প্রক্রিয়ায় যুগযুগান্তর অতিবাহিত হইয়াছে এবং হিন্দুত্ব হইয়া উঠিয়াছে একটি সম্পূর্ণ জীবন-দর্শন।

ইংরাজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন অসংখ্য মহাপুরুষ। তাঁহাদের মধ্যে উত্তর কলিকাতার সিমলা পাড়ার নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক হইয়া ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ। আপামর হিন্দুসমাজে 'স্বামীজী' নামেই তাঁহার বিশেষ পরিচিতি। তাঁহার পরমারাধ্য গুরুদেব এবং পথপ্রদর্শক ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ হইলেন শাশ্বত ভারতের জাগ্রত বিবেক । শিবকল্পপুরুষ স্বামীজীর আবির্ভাবে সমগ্র ভারত লাভ করিল নূতন সঞ্জীবনী, অগ্রগমনের নবদিশা। জাতির জীবনে সঞ্চারিত হইল বিবেকবোধ। ভারতবর্ষের মঙ্গলের চিন্তা করিতে করিতে তিনি 'ঘনীভূত ভারত'-এ পরিণত হইলেন। দেশ ও ধর্মের উপর সংঘটিত আঘাত প্রতিরোধে যুবসমাজকে আহ্বান জানাইলেন তিনি। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিলেন ভারতজননীর অংসখ্য দামাল সন্তান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁহারা গড়িয়া তুলিলেন আগ্নেয় প্রতিরোধ। অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম হইল জাগ্রত বিবেকবোধের অন্যতম পূর্বশর্ত। বঙ্গীয় নবজাগরণ পর্বে উন্নত দেশ ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে স্বামীজী এবং তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ স্থাপন করিলেন 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'-নামক একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। 'যত্র জীব তত্র শিব' এবং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-র মহান ব্রতকে ধ্যেয় করিয়া শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথামৃতে উদ্দীপ্ত, শ্রীশ্রী জগজ্জননীর চরণে সমর্পিত, স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ সেবাব্রতী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিরন্তর করিয়া চলিয়াছেন নানাবিধ সেবাকার্য। স্বামীজীর ভাষ্যকে পাথেয় করিয়াই বিশ্বব্যাপী বিকশিত হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন। এই আন্দোলন ধর্মের গ্লানি এবং সামাজিক অবক্ষয়কে জয় করিয়া মানবজাতির বুকে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতেছে। জীবনের অর্থানুসন্ধান-সহ মোক্ষলাভের চিরায়ত পথের পথিক হইয়া উঠিতেছেন অগণিত নর-নারী। মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে প্রতি মুহূর্তে যাচাই হইতেছে তাহাদিগের জীবনচরিত। ঝঞ্ঝাপ্রবণ মহাসমুদ্রে হালভাঙা তরীর বিভ্রান্ত নাবিকগণের ন্যায় সমস্যাজর্জরিত মানুষ পাইতেছেন মুক্তির সংকেত। স্বামীজী প্রদত্ত উপদেশ এবং তাঁহার জীবনাদর্শের স্মরণ-মননের মাধ্যমে আগামীদিনে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে বিবেকবোধের সার্বিক জাগরণ অবশ্যম্ভাবী।

সুভাষিতম্

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।(শ্রীগীতা ২।৬৩)

ক্রোধ হতে মূঢ়ভাব উৎপন্ন হয়, মূঢ়ভাব হতে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশ হতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধি নাশ হলে পতন হয়।

সিপিএমের পতন নিশ্চিত করেছিল নিঃশব্দ পুলিশ বিদ্রোহ

সরছে পুলিশ কাঁপছে মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন উঠেছে কে কার পদানত, পুলিশ মমতা ব্যানার্জির নাকি মমতা ব্যানার্জি পুলিশের? মমতা আর পুলিশের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘিরে জল্পনা চলছে। কাদের বাঁচাতে মমতা পুলিশকে বলির পাঁঠা করছেন? কেন? পুলিশের ওপর মমতার সাম্প্রতিক উষ্মা তার প্রমাণ। জমি কেলেঙ্কারি আর তোলাবাজিতে জড়িয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর খুন হলে মমতা সেটাকে পুলিশের অপদার্থতা বলছেন। পুলিশ কি তাহলে তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে? সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক ছিল।

নজর ঘোরানোর খেলায় মমতার নতুন দান বিএসএফকে আক্রমণ। ২০২৬-এর রাজ্য ভোট পর্যন্ত বিএসএফের উপর যে আক্রমণ চলবে তা বলতে পারি। ইডি, সিবিআই-এর পর বিএসএফ তাঁর লক্ষ্য। মমতা যাঁকে এসটিএফের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের ভূমিকা নিয়ে অভয়াকাণ্ডে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। জঙ্গি দমনে এসটিএফের ভূমিকা রয়েছে।

অনুপ্রবেশকারীদের উপর মমতা অনেকটাই উদাসীন। এখনও পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো কড়া পদক্ষেপ নেননি। বেশিরভাগ অনুপ্রবেশকারী আর জঙ্গি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে মমতা ১০০ শতাংশ মুসলমান ভোট নিশ্চিত করতে চান। বাংলাদেশে হিন্দু নিধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিজেপি এই রাজ্যের হিন্দু ভোটকে যে বড়োভাবে একত্রিত করবে তা স্বাভাবিক। পালটা হিসাবে মমতা মুসলমান ভোটকে ৯২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশ করতে চান। তাই জঙ্গি আর অনুপ্রবেশকারীদের সরাসরি লক্ষ্য না বানিয়ে তিনি পুলিশকে বলির পাঁঠা করে আক্রমণ করছেন। তাঁর এই ব্যবহারকে অনেক পুলিশ অফিসার 'অদ্ভুত' বলেই মনে করছেন। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে ৫৭ পাতার বক্তব্য দিয়েছেন অভয়ার অভিভাবকরা। তাঁদের সঙ্গে প্রধান অভিযুক্তর কথায় খানিকটা মিল রয়েছে। উভয়ের মতে অনেকে মিলে অভয়াকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে ভুলপথে চালনার উদ্দেশ্যেই রাজ্যের পুলিশ একজনকে বোড়ে সাজিয়ে তুলে ধরেছিল। ৫ দিন ধরে (৯-১৩ সেপ্টেম্বর) তথ্য লোপাট আর মিথ্যা গল্প সাজিয়েছিল। গুন্ডা দিয়ে হাসপাতাল ভেঙেছিল। মমতার নির্বাচনী সাফল্যের পিছনে রয়েছে মুসলমান ও মহিলা ভোট আর বেশ কিছু পুলিশ, আমলার হাতযশ।

পতনের আগে পুলিশ সিপিএমের হাতছাড়া হয়েছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাম সংস্কৃতি নিয়ে মোহগ্রস্ত ছিলেন। পুলিশকে কী করে বশে রাখতে হয় জানতেন না। পুলিশকে নিয়ে তিনি ফুটবল ক্রিকেট খেলতেন। এ ব্যাপারে জ্যোতি বসু অনেক পারদর্শী ছিলেন। তিনি পুলিশে ইউনিয়ন তৈরি করে বেশ কিছু অফিসারকে নিজের তাঁবে রেখেছিলেন।

> **ভোটের স্বার্থে মমতা যদি পুলিশকে ফাঁসাতে উদ্যত হয় তাহলে সিপিএমের মতো মমতাকেও পাটকেল খেয়ে সরে যেতে হবে। ভীমরুলের চাকে ঢিল মারলে অন্তত হুল তাঁকে খেতেই হবে।**

পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার তাঁকে 'মনীষী' বলে সম্বোধন করেছিলেন। জ্যোতি বসুর সরকারকে রাজ্যের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেনি। বুদ্ধদেবের সরকারকে বাতিল করেছিল। ক্ষমতায় আসার পর মমতা পুলিশের পিঠের ছাল তুলে দিতে চাইতেন। পরে সেই পুলিশেরই এক কর্তাকে বাঁচাতে রাত জেগে ধরনায় বসেছিলেন। রাজ্য পুলিশের সেই সর্বময় কর্তা রাজীব কুমার এখন জামিনে রয়েছেন। তিনি বোধহয় একমাত্র পুলিশ অফিসার যিনি অপরাধীদের মতো জামিন নিয়ে দপ্তর চালাচ্ছেন। ক্ষমতা ধরে রাখার লোভে মমতা যে ক্রমশ পুলিশের হাতের পুতুল হয়ে উঠছেন তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেননি। বামপন্থী পুলিশ ভাঙার কাজ করেছিলেন মমতার এক সময়ের সেনানী মুকুল রায়। শারীরিক কারণে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তিনি এখন সরে রয়েছেন। সর্বপ্রথম তিনি বুঝিয়েছিলেন ঘাড়ে চেপে বসা প্রশাসনকে ঝেড়ে ফেলতে প্রথম তার অস্ত্রধারীকে নিরস্ত্র করতে হয়। তাঁকে তৃণমূলের চাণক্য বলা হতো। এই মুহূর্তে পুলিশের উপর মমতার আস্থা খানিকটা টলে গিয়েছে। তাই নিজে পুলিশ মন্ত্রী হয়েও তাদের অপদার্থতার কথা বলতে পিছপা হচ্ছেন না। মমতাকেও সেই অপদার্থতার দায় নিতে হবে। পুলিশ মন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করে তিনি ২০২৬-এর নির্বাচন লড়লে তাঁর শক্তি বোঝা যাবে। ২০২১-এর বিধায়ক পরীক্ষায় মমতা দু'বারের চেষ্টায় পাশ করেন। পদত্যাগের সংস্কৃতি কংগ্রেসে বড়ো একটা নেই। মমতা সেই সংস্কৃতির উপজাত সন্তান। তবে পুলিশ তাঁকে রেহাই দেবে না। ভোটের স্বার্থে মমতা যদি পুলিশকে ফাঁসাতে উদ্যত হয় তাহলে সিপিএমের মতো মমতাকেও পাটকেল খেয়ে সরে যেতে হবে। ভীমরুলের চাকে ঢিল মারলে অন্তত হুল তাঁকে খেতেই হবে। □

ছদ্ম লড়াইয়ের শেষে, আমে দুধে মিশে!

বহুরূপেষু দিদি,

আপনি একা কিন্তু একা নন। দিদি আমি জানি। এক আপনার মধ্যে অনেকের বাস। আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আপনি তৃণমূলের দলনেত্রী। আবার একজন ক্ষমতাপ্রিয়ের পিসিমণি। তাই নানা রূপের আপনাকে নানা সময়ে নানা দিকে ঝুঁকতে হয়। বেশ করেন। রাজ্য বা দল অনেক পরে। দিদি, পরিবার সবার আগে। পরিবারতন্ত্র না থাকলে এই দেশে প্রকৃত বিরোধী হওয়া যায় না।

কিন্তু আপনি কতটা গণতান্ত্রিক যে, পরিবারের বাইরের লোককে দিয়ে পরিবারের সেতুবন্ধন ঘটান। কিছুদিন আগেই শুনেছিলাম, দলের সর্বোচ্চ স্তরের দূরত্ব মিটিয়ে ফেলতে 'সেতুবন্ধন' হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসে। এই কাজ হাতে নিয়েছে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মানে ভাইপোর সঙ্গে রাজ্য সভাপতির দীর্ঘ বৈঠকে সেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তার পরে এখন শুনছি মিটমাট নাকি হয়ে গিয়েছে। সত্যি দিদি! দলে, সরকারে এবার অভিষেকের কথামতো রদবদল করবেন নাকি!

সরকারি কাজের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বছর খানেক আগে থেকেই নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক। সরকার বহু পরিকল্পনা হাতে নিলেও রূপায়ণে গাফিলতি নিয়ে দলের মধ্যে সরব হয়েছেন অভিষেক। মন্ত্রী ও আমলাদের নজরদারির অভাবে মানুষের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছয় না বলেও মত তাঁর। একাধিক বার এই প্রশ্ন তুলে দলের নিয়মিত কাজকর্ম থেকে দুরে থেকেছেন তিনি। আবার পরিচালনায় তাঁর কিছু সিদ্ধান্ত পছন্দ ছিল না আপনারও।

এখন যা শুনছি সুব্রত বক্সির উপস্থিতিতেই পিসি-ভাইপো শীর্ষ-সম্মেলন হয়েছে। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই সংগঠন ও প্রশাসন নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক সেরে ফেললেন আপনি। আপনার সঙ্গে এই বৈঠকে ছিলেন অভিষেক। পরে সেখানে উপস্থিত হন রাজ্য সভাপতিও। সেখানেই সংগঠন ও প্রশাসন নিয়ে দলের অন্দরে উদ্ভূত জটিলতা নিয়ে সবিস্তার আলোচনা হয়েছে। এই জটিলতা কাটাতেই আপনার পরামর্শে একগুচ্ছ সিদ্ধান্তও নিয়েছেন অভিষেক। দলীয় সূত্রে খবর, গত লোকসভা ভোটের ফলের ভিত্তিতে যে সব পদক্ষেপ নিয়ে অভিষেক এগোতে চেয়েছিলেন, সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানেই এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে সময় নষ্ট না করার কথাও উল্লেখ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। জানা গিয়েছে, তাঁর ভাবনায় সায় দিয়ে গোটা বিষয়টিতে সমন্বয় তৈরির ভার দেওয়া হয়েছে রাজ্য সভাপতিকে।

প্রায় অধিকাংশ বিষয়েই নাকি মীমাংসাসূত্র বেরিয়ে এসেছে। তার ভিত্তিতেই এবার রদবদল হবে। সংগঠন ক্ষেত্র নিয়েও আপনি-অভিষেক মত বিনিময় করেছেন শুনলাম। এ ব্যাপারে আপনারা দু'জনেই কড়া হওয়ার পক্ষপাতী। মন্ত্রীসভার কাজকর্মও আপনাদের আলোচনায় আসে।

খেয়াল রাখবেন, ভাইপো কিন্তু আপনাকে ঠেলে জাতীয় রাজনীতিতে পাঠাতে চান। তাতে ফাঁকা মাঠে খেলবেন বলে ভেবে রেখেছেন।

আমি খুব খুশি দিদি। এই যে আপনার ভাইপো আপনার কথা শুনছে, আপনি ভাইপোর কথা শুনছেন এটায় আমি খুশি। কিন্তু দিদি, আপনার দলের দলতু তো ভাইয়েরা খুশি নন। তাঁরা আড়ালে বলছেন, 'আমে দুধে মিশে গেল।' এবারে তাঁরা আঁটির মতো গড়াগড়ি খাবেন কিনা তা নিয়ে অনেকের মনেই চিন্তা।

সে চিন্তা তো হবেই। আপনার দলের দুই শিবির নিয়ে টানাটানিটাই তো আসল। এতে রাজ্যের উন্নয়ন, দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা থাকে না। সংবাদমাধ্যমে সে সব নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। মাঝে মাঝে ভাইপো এমন সব কথা বলেন যাতে মনে হয় এই বুঝি তিনি আলাদা দলই গড়ে ফেললেন। আপনি আবার নানা কথায় বুঝিয়ে দেন যে, সে মুরোদ নেই কারও। এ সবের মধ্যে আপনার দলে কিছু 'নারদ' রয়েছেন, যাঁরা ঝগড়া লাগাতে ওস্তাদ। ঘন ঘন পক্ষ বদল করে তাঁরা বুঝতেই দেন না ঠিকঠাক কোন দলে তাঁরা। পিসি-তৃণমূল নাকি ভাইপো- তৃণমূল!

তাঁরা ওসব চিন্তা করুক। পাত্তা দেবেন না। তবে খেয়াল রাখবেন, ভাইপো কিন্তু আপনাকে ঠেলে জাতীয় রাজনীতিতে পাঠাতে চান। তাতে ফাঁকা মাঠে খেলবেন বলে ভেবে রেখেছেন। আর একটা কথা বলতে মুখে বাজে তবু বলে রাখি দিদি, জাতীয় রাজনীতিতে কিন্তু আপনি ভুলেও যাবেন না। প্রথম কথা আপনার ইন্ডি দলের লোকজন ভালো না। সবাই ল্যাং মারার ওস্তাদ। আর আপনার ইমেজও গ্যামাকসিন হয়ে রয়েছে। রোয়াকের ভাষা বললাম দিদি, রাগ করবেন না। ভালো থাকবেন। ছদ্ম লড়াই না ছদ্ম সমাধান তা নিয়ে আমার মনে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। ছোটোভাই হিসাবে বলে রাখলাম।

ভারত সংস্কৃতির বিরাট দর্শন কুম্ভমেলা

কুম্ভমেলা স্বয়ং একটি জলপ্রতীক। জলকে কুম্ভে সঞ্চয় করা হয়। কুম্ভ বা পাত্র ছাড়া জলকে সঞ্চিত রাখা সম্ভব নয়। একইভাবে জলাশয় বা নদীতট ছাড়া কুম্ভমেলার মতো এত বড়ো আয়োজনও সম্ভব নয়। ঋষিগণ মানব সমাজকে এইসব উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলের গুরুত্ব, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার বার্তা দিয়েছেন।

অতিথি কলম

গুঞ্জন আগরওয়াল

ভারতীয় সংস্কৃতিতে কুম্ভমেলা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ভাগবতপুরাণ (স্কন্ধ ৮, অধ্যায় ৫) অনুসারে চাক্ষুষ-মন্বন্তরে (পৌরাণিক কালগণনা অনুসারে ৪২-৮৯ কোটি বছর পূর্বে) ভগবান বিষ্ণু কূর্ম অবতার গ্রহণ করেন এবং ক্ষীরসাগর মন্থনে ১৪টি রত্ন উঠে আসে। এই সমুদ্র মন্থনেই অমৃতকলসও (কুম্ভ) উঠে আসে, যা পাওয়ার জন্য দেবাসুরে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এই সব দেখে ভগবান বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে দেবতাদের অমৃতপান করানোর জন্য পঙ্‌ক্তিবদ্ধ করে বসান। বিতরণ করার জন্য মোহিনীরূপী বিষ্ণু ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে অমৃতকলস ধরতে দেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব দেন নবগ্রহের মধ্যে থেকে সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি ও শনিদেবকে। কলস যাতে অক্ষত থাকে তার দায়িত্ব সূর্যদেবের হাতে ন্যাস্ত হয়, অমৃত যাতে না পড়ে যায় তা চন্দ্রকে দেখতে বলা হয় এবং অসুরদের থেকে অমৃতকুম্ভ সুরক্ষার দায়িত্ব বৃহস্পতির ওপর। শনিদেব জয়ন্তকে রক্ষার ভার গ্রহণ করে।

এই চার গ্রহের চারটি স্থানের সঙ্গে কুম্ভপর্বের কাহিনি জড়িয়ে রয়েছে। অসুরদের থেকে কলসের রক্ষার জন্য জয়ন্তকে চতুর্দিকে পালিয়ে বেরাতে হয়। পালানোর পথে নাসিক, উজ্জয়িনী, হরিদ্বার ও প্রয়াগে কলস থেকে অমৃতবিন্দু মাটিতে ছলকে পড়ে যায়। এই চারটি স্থান মহাপবিত্র বলে গণ্য হয়। এজন্য এই চারস্থানে কুম্ভমেলার আয়োজন হয়। হরিদ্বারে অমৃত যখন পড়ে সেসময় রবি মেষরাশিতে এবং বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে প্রবেশ করে। প্রয়াগে অমৃত পড়ার সময় রবি মকররাশিতে (মকর সংক্রান্তি) এবং বৃহস্পতি বৃষরাশিতে প্রবেশ করে।

হরিদ্বার ও প্রয়াগ কুম্ভের মাঝে ৬ বছরের ব্যবধানে অর্ধকুম্ভের আয়োজন হয়ে থাকে। যখন রবি মেষরাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহরাশিতে প্রবেশ করেছিল তখন উজ্জয়িনীর শিপ্রাতটে অমৃত পড়ে। এই ঘটনার স্মরণে প্রত্যেক ১২ বছরে সিংহস্থকুম্ভ হয়। রবি ও বৃহস্পতি উভয়েই যখন সিংহরাশিতে প্রবেশ করেছিল তখন নাসিকের গোদাবরীতে অমৃত পড়ে। নারদীয়পুরাণ (২-৬৬-৪৪), শিবপুরাণ (১-১২-২২-২৩), বরাহপুরাণ (১-৭১-৪৭-৪৮) এবং ব্রহ্মপুরাণেও কুম্ভ ও অর্ধকুম্ভের আয়োজন নিয়ে জ্যোতিষীয় বিশ্লেষণ রয়েছে। কুম্ভপর্ব প্রতি ৩ বছরের ব্যবধানে হরিদ্বার থেকে আরম্ভ হয়। এর পরেই প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে কুম্ভ হয়।

সংস্কৃতির অমূল্য রাশি

ভারত তথা বিশ্বের কোটি কোটি হিন্দু ও প্রবাসী ভারতীয় যুগ যুগ ধরে কুম্ভের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে চলেছে। কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা, আত্মীয়-স্বজনদের আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে কিন্তু কুম্ভ বিশ্বের এমন একটা পর্ব যাতে কোনো আমন্ত্রণ নিষ্প্রয়োজন। ভাষা-ভেদ, জাতি-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, প্রান্ত-ভেদ, আয়ু-ভেদ এমনকী সাধন-ভেদের ঊর্ধ্বে উঠে শুধু বিশ্বাসে ভর করে কোটি কোটি লোক সহস্রাব্দ ধরে শুধু পঞ্চাঙ্গে তিথি দেখে পবিত্র পর্ব উদ্‌যাপনের জন্য সকলে একত্রিত হয়। কুম্ভ এমন এক বিরাট পর্ব যেখানে সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি তার সম্পূর্ণ বৈভব, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। এটি ভারত-সংস্কৃতির বৃহত্তম মিলন কেন্দ্র। দেশের সাধারণ মানুষ কুম্ভকে একটা বড়ো সংযোগরূপে দেখে এবং এতে 'কল্পবাস' করাকে পরম সৌভাগ্যরূপে মনে করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন পায়ে হেঁটে ও গাড়িতে চেপে কুম্ভে পৌঁছায়, নদীতে স্নান করে এবং অমৃতের অনুভূতি লাভ করেন। কুম্ভ মেলার (কল্পবাস) সময় কে রাজা, কে ভিখারি, কে সাধু-সন্ন্যাসী সকলেই বালুকাময় শীতল ভূমিতে শয়ন করেন। একবার ভোজন এবং তিনবার স্নান, পূজা, যজ্ঞ ও ভগবদ্‌ভজন করতে থাকে।

বহু সম্প্রদায়ের অপূর্ব সম্মিলন

কুম্ভে হিন্দুধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়, ঋষি-মুনি, যোগী, তপস্বী, সাধুসন্ত মুক্ত মনে সম্মিলিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। কুম্ভ প্রধানত সাধু-সন্ন্যাসীদের পর্ব বলে মনে করা হয়। প্রাচীনকাল থেকে আত্মসাক্ষাৎকার রূপী অমৃত প্রাপ্তির জন্য সাধুসন্তরা কুম্ভে একত্রিত হতে থাকেন। আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শাঙ্করমঠ তথা দশনামী নাগা-সন্ন্যাসীরা এই পর্বে অবশ্যই সম্মিলিত হয়। দেশের যে কোনো প্রান্তে বসবাসকারী, হিমালয়ের গুহায় নির্জনে সাধনরত সাধু-সন্ন্যাসীও

কুম্ভে স্নান করতে সম্মিলিত হন। নদীর পাড়ে একত্রিত হয়ে অধ্যাত্ম সাধনা, ধর্মচর্যা ও ধর্মের প্রসার-প্রচারের জন্য চর্চা-আলোচনা করা, আবার নিজেদের বিচার বিশ্লেষণকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য পরিভ্রমণের পরম্পরা ছিল এবং আজও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আজকেও সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কুম্ভের এই পর্বে এসেই গ্রহণ করেন এবং নতুন শিষ্যদেরও এই সময় সন্তসমাজে সম্মিলিত করেন। মহামণ্ডলেশ্বরের চয়ন প্রক্রিয়া এই সময়েই হয়। সন্তসাধুরা ধর্ম, দর্শন, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তি, তর্ক ও আলোচনা করেন। আগামী ১২ বছরের জন্য হিন্দুধর্মের পঞ্জিকা, আখাড়ার কর্মসূচি এবং সমাজে ঘটমান ঘটনাবলীর ওপরও চিন্তা করা হয়ে থাকে।

সনাতন হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শ্রীবৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব, রুদ্র, মাধ্ব, সনক, বল্লভ, রামানুজ, হরিদাসী, স্বামী নারায়ণ, প্রণামী, পাঞ্চরত্ন, নারায়ণী, দশনামী, নাথ, কাপালিক, লিঙ্গায়ত বা বীরশৈব, পাশুপত, অঘোর, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, নারসিংহ, স্মার্ত, রামানন্দী, শ্বেতাম্বর, দিগম্বর, হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, শিখ, রামরঞ্জা, কবীরপন্থী, খালসা, অকালী, উদাসী, নামধারী, নিরঞ্জনী, নিরংকারী, রাধাস্বামী ইত্যাদি সমস্ত মত-পথের অনুসরণকারীরা উৎসাহের সঙ্গে কুম্ভমেলায় অংশগ্রহণ করে। সাধু-সন্ন্যাসী, সন্ত-মহন্ত, মঠাধীশ-মহামণ্ডলেশ্বর, পীঠাধীশ্বর, ধর্মাচার্য-শঙ্করাচার্য নিজ নিজ আখাড়া-আশ্রমের সঙ্গে মাসখানেক সময় ধরে আস্তানা করে থাকেন এবং নিজ নিজ আখাড়ার আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা বের করেন। কত-শত সাধু ধূনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন, কীর্তন করেন, সাধনায় রত থাকেন। বহু হঠযোগী কুম্ভে এসে নিজেদের যোগসিদ্ধি ও অলৌকিকত্ব সাধারণ মানুষের সামনে প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন বেশে ও মুদ্রাতে আসা কত সাধুসন্ত চর্চা ও কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠেন। এরকম এক-একটি কুম্ভমেলায় হিন্দুধর্মের বিরাট রূপের সঙ্গে ক্ষুদ্র ভারতের রূপের দর্শন শুধু হয় না, এতে ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক একতাও সুদৃঢ় হয়।

কুম্ভমেলায় দেশ-বিদেশ থেকে আসা লক্ষ-কোটি দর্শনার্থী-তীর্থযাত্রী মেলা-পরিসর ভ্রমণ করেন এবং সাধুসন্তের শিবিরে গিয়ে তাঁদের বিষয়ে জানার চেষ্টা করেন। অধ্যাপক সঙ্গমলাল পাণ্ডের কথায়, ‘বিবিধ ধর্মাচার্যদের কী সিদ্ধান্ত তা তাঁদের প্রবচনে শোনা যায়। তাঁদের কেমন সাধনা, তা তাদের জীবনচর্যাতে দেখা যায়। তাঁদের কী সাংস্কৃতিক অবদান তা তাঁদের সংগীতানুষ্ঠান, মন্দির নির্মাণ, যজ্ঞভূমি নির্মাণ ইত্যাদির মধ্যে দেখা যায়। তাঁদের গ্রন্থ কী ও গুরু কে সেসব সেখানে উপস্থিত সন্ন্যাসীদের দেখে এবং তাঁদের অনুযায়ীদের স্বাধ্যায় দেখলে বোঝা যায়। তাঁরা কীভাবে দীক্ষা দেন তা তাঁদের দীক্ষা-সমারোহ থেকে অনুভব যেতে পারে। তাঁদের লক্ষ্য কী তা তাঁদের সৎসঙ্গ থেকে জানা যেতে পারে। এভাবে কুম্ভমেলা অধ্যাত্ম সাধনা ও ধর্ম-দর্শনের পদার্থ শিক্ষা উপস্থাপন করে। তা হিন্দুধর্মের সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবরূপ প্রদান করে যাকে বিবিধতার মধ্যে একতা বলা হয়। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, কাউকে হিন্দুধর্ম অনুভব হলে, হিন্দু-ভাবনার আদর্শকে বুঝতে হলে তাকে কুম্ভমেলা দর্শন করতে হবে।

কুম্ভমেলা এবং জল-সংরক্ষণ

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ নদীতটেই হয়েছে। বড়ো বড়ো সভ্যতা-সংস্কৃতি নদীতটে পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়েছে। আমাদের দেশে নদী ও সরোবরের তীরে মেলার আয়োজন হয়ে চলেছে। প্রশ্ন ওঠে, নদীতটকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয়? স্নান করা একটা বড়ো কারণ হতে পারে সঙ্গে অধ্যাত্মও যুক্ত রয়েছে। কুম্ভমেলাও সেই ধারার অন্তর্গত। কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ একই সময়ে, একই জলে, এক ভাবনায় একত্রিত হয়। জীবনদায়িনী নদীর আশেপাশে এত বড়ো আয়োজনের কোনো না কোনো যুক্তি তো অবশ্যই রয়েছে। শুধুমাত্র বিশ্বাস, পুণ্যস্নান ও মোক্ষের মতো বিমূর্ত ধারণা এর আবশ্যকতা হতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা জলরাশিকে এত বেশি গুরুত্ব এই কারণেই দিয়েছেন যাতে জনসাধারণ বার বার জলের কাছে যায়, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তার সৌন্দর্য, রক্ষণাবেক্ষণ, স্বচ্ছতা ও সুরক্ষা করে। কুম্ভমেলা স্বয়ং একটি জলপ্রতীক। জলকে কুম্ভে সঞ্চয় করা হয়। কুম্ভ বা পাত্র ছাড়া জলকে সঞ্চিত রাখা সম্ভব নয়। একইভাবে জলাশয় বা নদীতট ছাড়া কুম্ভমেলার মতো এত বড়ো আয়োজনও সম্ভব নয়। ঋষিগণ মানব সমাজকে এইসব উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলের গুরুত্ব, সংরক্ষণ ও সুরক্ষার বার্তা দিয়েছেন।

(লেখক একজন ইতিহাসবিদ ও স্তম্ভলেখক)

শোক সংবাদ

কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগের দয়ানন্দ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক গোবিন্দ শর্মা গত ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পালের মেজদা মুক্তিপদ পাল গত ১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৫ কন্যা, নাতি-নাতনি এবং বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজসেবামূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক বছর তাজপুর গ্রাম ষোলোআনার মুখ্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরই প্রেরণায় তাজপুর গ্রামে মা সারদা গ্রাম বিকাশ সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রেরণায় তাজপুর গ্রামে তিনটি অনুন্নত পাড়ায় শিশু সংস্কার কেন্দ্র, পাঠদান কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, সেলাই কেন্দ্র শুরু হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রাম বিকাশ সমিতির স্থায়ী কার্যালয় তৈরি হয়েছে।

* * *

দক্ষিণেশ্বর নগর শাখার স্বয়ংসেবক গৌরব ভট্টাচার্যের বাবা সুতনু ভট্টাচার্য ৪ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী এবং একমাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন।

হিন্দুশূন্য করতে গিয়ে বাংলাদেশই শেষ হতে চলেছে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

আমেরিকার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী সেক্রেটারি অব স্টেট 'ডোনাল্ড লু' আর তার পোষ্যপ্রাণী তৎকালীন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের দ্বারা— জো বাইডেনের 'হাসিনা সরাও'— নামক নাটক মঞ্চস্থ করার মাধ্যমে বাংলাদেশে যে উগ্রবাদী মুসলমানরাজ কায়েম হয়েছিল তার ফলাফল পেতে শুরু করেছে দেশটির হিন্দুরা। হাসিনার দেশ ত্যাগের পরপরই দেশটির হিন্দুদের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন শুরু হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এক কথায় পশুবৃত্তি কায়েম করে তিন কোটি অমুসলমানের জীবনে এক ঘোর অন্ধকার নামিয়ে হয়েছে। প্রথম ধাপে তারা হিন্দুদেরকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, প্রশাসনিক স্তর-সহ সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো হিন্দুদের নিয়োগ না করা হয় সেজন্য সরকারের তরফ থেকে আদেশও জারি করেছে। এক কথায় বাংলাদেশে আর কোনো হিন্দুকে চাকুরিতে নিয়োগ করা হবে না। ডোনাল্ড লু এবং তার গ্যাংদের অমানবিক গোপন চুক্তিতে সম্মতি দিয়ে ইউনুস সরকার বাংলাদেশকে যে প্রক্রিয়ায় খাদের ধারে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে শুধু বাংলাদেশই নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক দেশের অশান্তির কারণ হয়েও দেখা দিয়েছে।

সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর বলে বিশ্বখ্যাত পাকিস্তান নিজের পরনের কাপড় খুলে যাচ্ছে দেখেও অন্যের দেশে উগ্রপন্থা রপ্তানি শুরু করেছে নতুন পদ্ধতিতে। নিজের মজুদের দিকে নজর না দিয়ে প্রায় দেউলিয়া দেশটি বাংলাদেশে জাহাজ ভর্তি করে পাঠাচ্ছে সামরিক সরঞ্জাম। তাদের ভরসায় বাংলাদেশের কিছু নতুন পাগল প্রকৃতির লোক ভারত আক্রমণের স্বপ্নও দেখতে শুরু করে দিয়েছে। কিছু লোক তো একেবারে তৈরিই হয়ে আছে, আল্লার নামে ভারত আক্রমণের জন্য। তারা আল্লার নামে, ইসলামের নামে প্রাণ কোরবানি দিয়ে বেহেস্তে গিয়ে বাহাত্তর হুর গ্রহণ করার স্বপ্ন দেখছে। তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিতেও ছাড়ে না। অথচ দেশটিতে একটিও পারমাণবিক অস্ত্র নেই। ভরসা সেই দেউলিয়া দেশ পাকিস্তান। তারা ভিক্ষা দেবে সে আশায় দিনগুনছে বাংলাদেশি জেহাদিরা। বাইডেনের রোপিত বিষবৃক্ষ মাটিতে শিকড় প্রসারিত করার আগেই আমেরিকার নতুন প্রশাসন সেটি গুড়িয়ে দেবে বলে বিশ্ব এখন অপেক্ষায় রয়েছে।

হিন্দুদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ মজ্জাগত হয়ে গেছে। হিন্দুদের দোকানের মিষ্টি খাবে না, হিন্দুদের সেলুনে চুল কাটাবে না, বাস্তবে তারা বেঁচে আছে হিদুদের ওপর ভর করেই। হিন্দুদের সম্পত্তি,ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করেই তো তারা দিনাতিপাত করে চলেছে। মুখে ভারতের পণ্য বয়কট। কিন্তু ভারত থেকে আলু-পেঁয়াজ মশলা ও চাল না গেলে তাদের হাঁড়ি চড়ে না। আসলে নির্লজ্জ বেহায়া না হলে এমন হওয়ার নয়। হিন্দুদের প্রতি একচেটিয়া একতরফা অন্যায় অত্যাচার একদিন বন্ধ হতে বাধ্য। হিন্দুরাও বসে নেই। যতই অত্যাচার হোক না কেন হিন্দুরা আর ভারতমুখী হবে না। তারা সংগঠিত হয়েছে, লড়াই সংগ্রামও করতে শুরু করেছে প্রাণপণে। চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে তারা আর পালাবে না। পৃথিবী এবার তাকিয়ে দেখুক হিন্দুরা কীভাবে বাঁচার জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। অকাতরে তারা প্রাণ দিচ্ছে। বীরের খাতায় নাম উঠছে প্রতিদিন। অত্যাচারী জেহাদি মুসলমানরা সারা পৃথিবী থেকে একদিন উচ্ছেদ হবে সেটাই সত্য হয়ে উঠবে। রক্ত পিপাসু জেহাদিরা একদিন সারা পৃথিবীতে বর্জিত হবেই। আর তা হবে আরও করুণ দৃশ্যের অবতারণার মাধ্যমে। ন্যায়ের সংগ্রাম মানে সত্যের সংগ্রাম। ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে এবং তারা একদিন সারা পৃথিবীতে হিন্দু জাগরণ ঘটবে। হিন্দুত্বের বিজয়ডঙ্কা বাজবে। ভারত হবে তার দিকদর্শন।

শোনা যাচ্ছে পিটার হাস কূটনৈতিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসার নামে বসে আছেন। উদ্দেশ্য একটাই, 'মেটিকুলাসলি ঘটানো সর্বনাশ' গুলির তদারকি করা। এরই মধ্যে দেশ ধ্বংসের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সব জায়গায় সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের বর্জিত মূর্খদের সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই তারাই নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে সারাদেশে। তাই ধাক্কা খাচ্ছেন সব জায়গায়। গুণীজনদের মুখে তালা। তাদের বলা এবং করার কিছুই নাই। মুক্তমনা সাংবাদিকদের পরিচয়পত্র বাতিল করে দিয়ে মাদ্রাসার ছাত্রদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সবক্ষেত্রে আল্লার আইন এবং মসজিদ ভিত্তিক ইসলামি শাসন কায়েম করে চিরতরে দেশটিকে ধ্বংস করে দিয়ে বানানোই একমাত্র কাজ। ভিখারি সংখ্যালঘু নাগরিকদের দিতে হবে জিজিয়া কর। তাদের গণ্য করা হবে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

কিছু ঘটলেই হিন্দুদের মামলার আসামি বানিয়ে দিয়ে জেলে ভরে দেওয়াটা তাদের নতুন পদক্ষেপে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে জামিন অযোগ্য ধারা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আইনের তোয়াক্কা ও পরিভাষার কোনো চিন্তা না করেই সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে জেলে রাখা হয়েছে। তার পক্ষে কোনো উকিলকেও সওয়াল করতে দিচ্ছে না। মাসের পর মাস বিনা অপরাধে জেলবন্দি রয়েছেন চিন্ময় প্রভু। বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সারা দেশের জেলগুলিতে রাজবন্দিদের হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে গোয়ান্দা সূত্রে খবর। হিন্দুশূন্য দেশ বানাতে গিয়ে বাংলাদেশ আজ শূন্য কলসীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাস বলে দেবে কী হবে দেশটির পরিণতি। □

হিন্দুদের লড়াইটা এখন জাত ধর্ম বাঁচানোর

বটুকৃষ্ণ হালদার

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম। আবার অন্যদিকে এই বিশ্বের উদাসীন জাতির নাম হলো হিন্দু। যার কারণে বিশ্বের বহু জায়গা থেকে হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার অন্যতম কারণ হিন্দুরা রাজনীতি সচেতন নয়। তারা আলস্যবশত ভোট দেন না। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা জেনে রাখা প্রয়োজন। বর্তমান পাকিস্তানের শিয়ালকোট ১৯৪৬ সালের আগে ভারতে ছিল। কিন্তু এখন নেই। ১৯৪৬ সালে হিন্দুবহুল হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত হয় শিয়ালকোট পাকিস্তানে যাবে। শিয়ালকোট লাহোর থেকে ১৩৫ কিলোমিটার দূরে। তার জন্য জনমত সংগ্রহ হয়। জনমত সংগ্রহের দিন মুসলমানরা ভোরবেলায় লাইনে দাঁড়িয়ে যায়। অনেক হিন্দু ভোট দিতে যায়নি। যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে ভিড় দেখে ফিরে আসে।

ফলস্বরূপ ৫৫ হাজার ভোটে মুসলমানরা জিতে যায় এবং শিয়ালকোট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, ভোটের দিন এক লক্ষ হিন্দু ঘরে বসে আয়েশ করেছে, ভোট দেয়নি।

১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শিয়ালকোটে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪১ হাজার, অথচ সে সময়ে ১ লক্ষ হিন্দু ভোট দেয়নি, অর্থাৎ ১ লক্ষ ৪১ হাজার ভোট দিয়েছিল। ৫৫ হাজার ভোটে হিন্দুরা হেরে যায়। মুসলমান ভোট পড়েছিল ১ লক্ষ ৯৬ হাজার। সোজা হিসাব, হিন্দুরা সবাই ভোট দিলে ৪৫ হাজার ভোটে জিতে যেত। শিয়ালকোট হাতছাড়া হতো না।

এর ফলস্বরূপ ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'তে হিন্দু মহিলাদের সতীত্ব নষ্ট হয়, পুরুষদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ১৯৫১ সালের জনগণনায় দেখা যায় ওখানে হিন্দু রয়েছে মাত্র ১০ হাজার। বর্তমানে মেরেকেটে ৫০০ জন। পাকিস্তানে এখন সংখ্যালঘু হিন্দুদের শুধুমাত্র খরচের খাতা হিসেবে ধরা হয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের দ্বিতীয় রূপ। ভারতবর্ষের বাজেট পেশে যেখানে মুসলমানদের জন্য নানারকম সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় সেখানে পাকিস্তান বাংলাদেশের মতো দেশে বাজেটে সংখ্যালঘুদের জন্য এক টাকাও বরাদ্দ করা হয় না। ওই দুই দেশে হিদুরা নামমাত্র বেঁচে আছে।

পেট্রোলের দাম ২০০৪ সালে ৫০ টাকা থেকে এখন ২০২৫ সালে ১০০ টাকা হয়ে গেছে, সেটা হিন্দুরা খেয়াল করেছে ঠিক। কিন্তু ১৯৪৭ সালে মুসলমান ৩ কোটি থেকে এখন ২০২৫ সালে ৪০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে সেটা খেয়াল করেনি। ১৯৪৬ সালে মাত্র ৬টা মুসলমান দেশ ছিল সেটা ২০২৫-এ ৫৭টা গিয়ে পৌঁছেছে সেটা কেউ খেয়াল করেনি। ১৯৪৭ সালে ৬ হাজার মসজিদ ছিল ২০২৫ সালে সেই সংখ্যাটা ১১ লক্ষ-তে পৌঁছেছে। ১৯৪৭ সালে ৩৪ হাজার গুরুকুল ছিল কিন্তু এখন ২০২৫ সালে মাত্র ৩টি গুরুকুল বেঁচে আছে, সেটা কেউ খেয়াল করেনি।

এক সময় বিশ্বের অন্য দেশে যখন কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না তখন ভারতবর্ষে গুরুকুলের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো। বর্তমানে ১০টি রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে, সেটা কেউ খেয়াল করেনি। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও হায়দরাবাদে কীভাবে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, মেয়েরা লাভ জেহাদের শিকার হচ্ছে, হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে, মুসলমানরা হিন্দুদের মন্দির ভাঙছে সেগুলো কেউ খেয়াল করেনি। শুধু পেট্রলের দাম কেন বেড়েছে, সেটা খেয়াল করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি হিন্দুমেয়ে মুসলমানদের লাভ জেহাদের ফাঁদে পড়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে আর কেরালায় মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার পর জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে ভারত ইসলামীকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রমাণ স্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গের মেয়র তথা মন্ত্রী প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের জন্য ডাক দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই অঘষিতভাবে শরিয়তি আইন চালু হয়ে গেছে। উত্তরবঙ্গে চোপড়া তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

১৯৭৭ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গ কোনোদিন কেন্দ্রে রাজ্যে এক সরকার পায়নি। তার ফল তারা ভোগ করছে, সচেতন না হলে আগামীদিনে আরও করবে। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বঙ্গে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলমানরা ঢেলে ভোট দিল মুসলিম লিগকে, আর বুদ্ধিমান হিন্দু বাঙ্গালিরা ভোট দিল ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসকে। হিন্দুমহাসভা ভোটে হেরে গেল। কী আনন্দ! বছর ঘুরতে না ঘুরতে পুঁটুলি হাতে বউ-বাচ্চা নিয়ে কোটি কোটি বাঙ্গালি হিন্দু ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে এলো পশ্চিমবঙ্গে। তাও লজ্জা নেই। আবার গর্ব করে বলে, আমাগো এত বিঘা জমি ছিল, এত বিঘা পুকুর ছিল। সব মনে আছে, শুধু মনে নেই কেবল কারা লাথি মেরে তাড়িয়েছিল। প্রশান্ত শূর, প্রমোদ দাশগুপ্ত তাড়া খেয়ে এখানে এসে কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন। কোনো চিন্তা নেই হিন্দু বাঙ্গালির। দু' টাকা কিলো চাল খাও, ভোটের আগে বিনা পয়সায় ডিমভাত খাও, দু' হাজার টাকায় শিক্ষকের চাকরি করো। ১০

রামমন্দিরের বিরোধিতা সবথেকে বেশি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহল বলেছিল লড়াইটা হোক ভাতের জন্য, জাত বা ধর্ম বাঁচানোর নয়। কিন্তু বিশ্বের ৫৭টি মুসলমান দেশ আর ৬৫টি খ্রিস্টান দেশ ভাতের লড়াই করেনি। তারা বুঝেছিল জাত ধর্ম যদি বাঁচে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্মভিটে এমনিতেই বাঁচবে।

ফঃ ২

বছর এসএসসি-র পরীক্ষা না হলেও কোনো প্রতিবাদ করো না। লক্ষ্মীভাণ্ডার, কন্যাশ্রী নিয়ে খুশি থাকো।

এসব দেখেও বাঙ্গালি হিন্দুদের হুঁশ আজও ফেরেনি। ইতিমধ্যে মুসলমানরা ভারতের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। সৌদি আরবের অধ্যাপক নাসির বিন সুলাইমান উল ওমর বলেছেন, 'ভারত গভীর ঘুমে। ইসলাম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হাজার হাজার মুসলমান পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্রে অনুপ্রবেশ করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় প্রবেশ করেছে। আজ ভারত যেন বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে। একটি জাতির উত্থান হতে যেমন যুগ যুগ লাগে, তেমনি তার ধ্বংসের জন্য সময় লাগে। ইরাক, ইরান, কাবুল, ইস্তানবুল, গান্ধার, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের মতো ভারত অবশ্যই ধ্বংস হবে। যদি হিন্দুরা এখনো পর্যন্ত সচেতন না হয়।

ভারতে প্রতিদিন প্রায় ৬৫ হাজার শিশুর জন্ম হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার মুসলমান শিশু এবং প্রায় ২৫ হাজার হিন্দু ও অন্যান্য। অর্থাৎ জন্মহার মুসলমানদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ। এখন জন্ম নেওয়া শিশুর মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং হিন্দুরা সংখ্যালঘু। এই হারে, ২০৫০ সালের মধ্যে মুসলমানরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। ভারতকে তখন ইসলামিক দেশ হতে কেউ বাধা দেবে না এবং তখন ভারত আর ভারত থাকবে না। আমরা মুসলমানরা হিন্দুদের মেরে শেষ করে দেব। আজ, সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, মুসলমানরা জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ, কিন্তু বাস্তবে তারা ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি পরিসংখ্যান ভুল, কারণ ওয়াহাবি মুসলমানরা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত সংখ্যা গোপন করে এবং কাফের হিন্দুদের অচেতন রাখার জন্য এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে তাদের অস্ত্র হিসেবে সবসময় ব্যবহার করে না।'

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভারতে চলছে মহা প্রতারণা, কিন্তু হতভাগ্য হিন্দুরা এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হিন্দুরা কেন কাশ্মীরের দিকে তাকিয়ে শিক্ষা পেল না, যেখানে হিন্দুদের তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ, নারী ও মেয়েদের পিছনে ফেলে চলে যেতে হয়েছিল। যতদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে ততদিন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, তারা সংখ্যালঘু হলে তাদের কী হবে তা তারা জানে না। এই বোকা হিন্দুরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কাফেরদের পরিসংখ্যান থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করে না। উল ওমর আরও বলেছেন, ''হিন্দু কখনো কথা বলবে না, নীরব থাকবে, উচ্চ নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করবে''। সুতরাং তার ভাগ্য অবশ্যই ডুববে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নাকি কাশ্মীর...কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, হায়দরাবাদ এবং অন্যান্য রাজ্যের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বিবেচনা করুন। আপনার শহরের মুসলমান জনগোষ্ঠীর কোনো এলাকায় যাবেন না, আপনি হয়তো তাদের অপলক দৃষ্টির মাঝে আপনার নিঃশ্বাস আটকে আছেন। এছাড়া জাম্বিয়া ও মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো উদাহরণ। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলিকে ইসলামি দেশ ঘোষণা করা হয়। লন্ডন, সুইডেন, ফ্রান্স, ও নরওয়ের মতো দেশে প্রতিদিন হিংসার ঘটনা ঘটে। হিন্দুরা কি কখনো ভেবে দেখেছে কেন এমন হচ্ছে?

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৯-১১ বছর বয়সি মুসলমান বাচ্চা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ। হিন্দু শিশুরা সেখানে মাত্র ৯ শতাংশ। মাত্র দশ বছর পর অর্থাৎ ২০৩১ সালেই এই সব শিশু আঠারো বছর পেরিয়ে ভোটাধিকার পাবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটাররা মোট ভোটার সংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। যদিও ৯ শতাংশ হিন্দু শিশু ও ২০৩১ সালে ভোট দিতে পারবে, তবুও ঠিকমতো হিসেব করলে দশ বছর পরে ২০৩১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটাররা হবে মোট ভোটারসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ। ওরা এককাট্টা হয়ে একটা দলকেই ভোট দেয়। হিন্দু ভোট অন্তত তিনভাগ হয়। ২০৩১ সালেও সম্ভবত এইভাবেই ভোট পড়বে। সেক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূমের মতো জেলাগুলোর যেসব বিধানসভা এলাকায় মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার (ভোটার সংখ্যার নয়) ৩৫ শতাংশ হবে, সেখানেও ভোটার সংখ্যার নিরিখে এককাট্টা হয়ে ভোট দিয়ে ওরা ওদের পছন্দের প্রার্থীকে জিতিয়ে দিতে পারবে; হিন্দুরা ভোট ভাগাভাগির কারণে অল্প পরিমাণ ভোটে হেরে যাবে। মালদহ, মুর্শিদাবাদের হিসেব তো ছেড়েই দিলাম। মুসলমানদের জন্মহার ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌলতে একমাত্র উত্তরবঙ্গের হাতে গোনা কিছু জেলা বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে বাকি সব জেলাতেই ২০৩১ সালের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৩৫ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলবে বা ছাপিয়ে যাবে— যার ফলে এই জেলাগুলোতে মুসলমান ভোটারদের সংখ্যা জেলার মোট ভোটার সংখ্যার ৪২-৪৫ শতাংশ হয়ে যাবে। যেহেতু তারা একসঙ্গে একটাই দলকে ভোট দেয়, তাই ২০৩১ সালে উত্তরবঙ্গের অল্প কয়েকটি জেলা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাকি সব জেলার অধিকাংশ আসনেই মুসলমানদের পছন্দের দল বা প্রার্থীরা জয়ী হবে। হিন্দু প্রার্থীরা ভোটভাগের কারণে কান ঘেঁষে হারবে। যদি সত্যিই তাই ঘটে, তাহলে ২০৩১ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মুসলমানদের পছন্দের প্রার্থী আর দল মিলিয়ে প্রায় ১৭০-১৮০টি আসন পাবে, যা পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়তে প্রয়োজনীয় ১৪৮ আসনের চেয়ে অনেক বেশি।

ফলাফল? ২০৩১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী ও ইসলামিক রাজ্য সরকার। পরিণাম? ১৯৪৭ সালের পুনরাবৃত্তি। অত্যাচার লুটপাট, দাঙ্গা, ধর্ষণ, খুন, পশ্চিমবঙ্গ ভাগ বা রাজ্য হাতছাড়া, হাজার হাজার মানুষ নিঃস্ব, গৃহহীন, মৃত। হিন্দু বাঙ্গালি আবার নিজের দেশে, নিজের রাজ্যে সহায়সম্বলহীন উদ্বাস্তু, পথের ভিখারি। কোনো নরেন্দ্র মোদী, অমিত শা, যোগী আদিত্যনাথ, জ্যোতি বোস, চোর পিসিমা কেউ বাঁচাতে পারবে না।

রামমন্দিরের বিরোধিতা সবথেকে বেশি করেছিল পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা। বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহল বলেছিল লড়াইটা হোক ভাতের জন্য, জাত বা ধর্ম বাঁচানোর নয়। কিন্তু বিশ্বের ৫৭টি মুসলমান দেশ আর ৬৫টি খ্রিস্টান দেশ ভাতের লড়াই করেনি। তারা বুঝেছিল জাত ধর্ম যদি বাঁচে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্মভিটে এমনিতেই বাঁচবে। আর সমগ্র বিশ্ব থেকে হিন্দুরা লাথি খাওয়ার পরেও তাদের হুঁশ ফেরেনি। এখনো যদি সচেতন না হয় তাহলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতের হিন্দু ও বাঙ্গালিরা উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। তারা যে সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিবেকসম্পন্ন মানুষদেরই রাজনীতিতে আসা প্রয়োজন

কল্যাণ গৌতম

রাজনীতিতে চাওয়া পাওয়া :

রাজনীতিতে চাইবার ব্যাপারে সাধারণত দু'টো মত রয়েছে। ১. উচ্চ পদমর্যাদা ও দায়িত্ব পাবার ব্যাপারে অনবরত আগ্রহ ও আবেদন করা। ২. উচ্চ নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দেওয়া, তাদের বিচারে তার পাবার কী আছে। তবে আর একটি সূক্ষ্ম মতও আছে। এরা যোগী, যোগ্য, যোগাযোগ-সক্ষম, অথচ 'অতিথি' গল্পের 'তারাপদ'-র মতো। নেতৃত্বের সব গুণই আছে, তবুও দেখতে দেখতেই গতিতত্ত্বের জাড্যতার প্রবাহে অন্যতর রাষ্ট্রবোধী কাজে ছুটে যান, ঋষি অরবিন্দের মতোই যেন তার অন্তর! রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই তার মানস-ভাণ্ডার—

'তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে—

যারে যায় না পাওয়া তারই হাওয়া লাগল কেন মোরে।'

এই মানসিকতা নিয়ে রাজনীতি করেন হৃদয়বেত্তারা, লৌকিক বোধিসত্ত্বরা। তাঁরা দল বিকাশের সময় ধূমকেতুর মতো কোথাও থেকে আসেন! অনেকটা গড়ে দিয়ে আবার মিলিয়ে যান অজান্তেই, অনন্ত সময়ের অতল গহ্বরে। দল তাদের খবরও রাখে না। যে দলে এই স্ট্যাটিস্টিকস রাখার, ইতিহাসের খেরোখাতা নেই, সে দল দীর্ঘমেয়াদে মানুষের মনে বেঁচে থাকতে পারে না।

সব দলেই এমন কিছু মানুষের উদয় হয় যারা প্রতিমা নির্মাণের বাঁশ-খড়ের কাঠামো বানান। তারপর আস্তে আস্তে মায়ের নামে একমেটে, দোমেটে শরীর গড়ে ওঠে। তারপর শেষ তুলির টানের সঙ্গে কোথায় এরা 'কিডন্যাপড্' হয়ে যান! অনন্ত কালের মধ্যে আর খুঁজেও পাওয়া যায় না! তারপর একদিন পূজা এসে যায়, অঞ্জলি হয়, প্রসাদ বিতরণ হয়। ওরা আর আসেন না। ওদের সংখ্যা কম হলেও ওরাই লোকস্মৃতিতে মানুষের মনের গভীরে কোনো দলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়ে যান।

ক্ষণজন্মা রাজনীতিবিদ ছিলেন পণ্ডিত

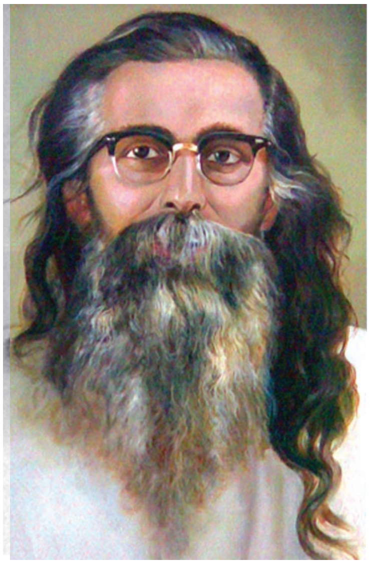

দীনদয়াল উপাধ্যায়। এমন মানুষকে খুঁজে নেবার জন্য একজন শ্রীগুরুজীর প্রয়োজন হয়। যিনি 'না চাইবার মানুষ'কে জোর করে দায়িত্ব দেন ঈশ্বরীয় কাজে। তাদের কাজের সৌকর্যেই সাফল্য আসে। বর্তমানে কোনো রাজনৈতিক দলেই এমন দায়িত্ববান, বিস্তারক জানা নেই, যিনি 'না চাইবার মানুষ'-কে খুঁজে এনে দায়িত্ব দেবেন। কারণ সর্বাধিনায়ককেও তো চাইতে হবে—

'যা না চাইবার তাই আজি চাই গো,

যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো।'

যার কিছু চা'বার নেই, যার অবিচার নেই, ঘৃণা নেই, প্রতিহিংসা নেই--- তাকেই রাজনীতির পদে জোর করে অধিষ্ঠান করানোর প্রবল প্রচেষ্টা নেই বলেই দলের লোভীমুখগুলি জানালা খুলে আপনার কাট-আউটগুলি বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। 'নেতার নেতা' হবেন মোহমুক্ত, মৌনমুখর, মহাজাগতিক মানস-মন্ত্রী। এসব কথা তাত্ত্বিক মনে হবে, অনেকটা 'আনফেল্ট নিড' বা 'অননুভূত প্রয়োজন' বলে বোধ হবে, তাই যতক্ষণ না এমন উদাহরণ বাস্তবে পাবো

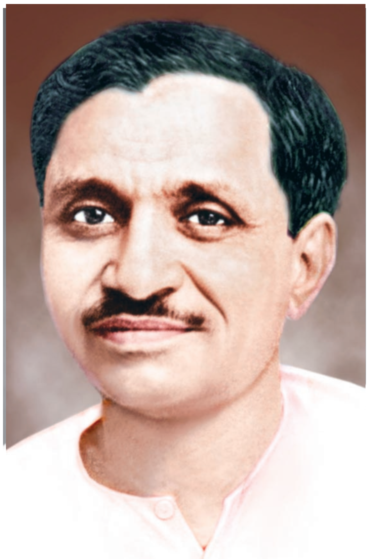

ততক্ষণ এই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। বরং বাকি দু'টি প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভালো মানুষেরা বোঝেন না যে এখনকার রাজনীতিতে 'গুঁতোগুঁতি' করতে হয়! এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এটাই কালের নিয়ম। কিছু ভালো মানুষ ও উচ্চ শিক্ষিত মানুষ রাজনীতিতে এসে গুঁতোগুঁতি করতে না পেরে, পায়ের তলার মাটি না পেয়ে পালিয়ে যান। কিছু চাইবার দূরে থাক, আপন যা সম্পদ নিয়ে রাজনীতিতে এসেছিলেন তাও পুরোটা ছুঁড়ে দিয়ে চলে আসেন। আর বাকি জীবনটা রাজনীতির তিক্ততা নিয়ে কালাতিপাত করেন। আবার কিছু অতিচালাক শিক্ষিত মানুষ, কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ রাজনীতিতে প্রায় কিছুই দেন না, মানুষকে প্রভাবিত করার

ক্ষমতাও তাদের থাকে না, তারা শুধু নিতেই আসেন। বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে আসা কিছু দীন ভিখিরি যেমন ভিক্ষেটা নেন, সঙ্গে লুকিয়ে গৃহস্থের দু'টো বাসনও ঝোলায় পোরেন, সে রকম মানসিকতা তাদের। নেতা সেটা বুঝতে পেরেও বলেন না কিছু, কারণ তারাও যে গোলাম শিক্ষাবিদ, জো হুজুরে, বাহুবলী নিয়ে ঘুরতে হবে!

স্পষ্ট কথা, যদি রাজনীতিতে সুশিক্ষিত, সুনির্মল, সুনাগরিক মানুষ না আসেন, তবে কুৎসিত রাজনৈতিক নেতার তত্ত্বাবধানেই আমাদের চলতে হবে। অন্য ভালো কিছু হবার নেই। তাই কোনোরূপ দ্বিধা না করে নিজের নিজের পছন্দের দলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুক্ত হোন এবং রাজনীতির আঙ্গিনা পরিষ্কার করে তুলুন। মন্দ মানুষেরা নতুন, প্রত্যাশী দলে একটি ইট পেতে লাইন দিয়ে যান, সুযোগ মতো সেই ইট সরিয়ে পাকা গাঁথনি তোলেন। এমন মানুষকে দলবদ্ধভাবে কোণঠাসা করে ভালো মানুষদের রাজনীতির আঙ্গিনা পরিষ্কার করতে হবে। তার জন্য হোক গুঁতোগুঁতি। 'স্বচ্ছ ভারত' গড়া মানে আগে রাজনৈতিক দলগুলিকে কলুষতা মুক্ত করাও বোঝাবে। রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পরাজিত হয়ে ফিরে যাবেন না। বলুন 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?' বলুন 'ফিরিবার পথ নাই'।

এখন নেতৃত্বেরও মোহমুক্ত হয়ে দেখা উচিত তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? কোন কোন যোগ্যতার মাপকাঠিতে কে কতটা এগিয়ে। রাজনীতিতে যে ব্যক্তি নিজের গুছিয়ে নেওয়া অদক্ষ মানুষদের নিয়ে মস্ত সংসার পাতেন, তিনি একটা সময় আর সে সংসার চালাতে পারেন না। বিপক্ষের মানসরূপকে আপনার গুণে যে নেতা আপনার স্রোতে এনে ফেলতে পারেন, সবার সঙ্গে কেন্দ্রীভূত বল জোগাতে পারেন, সর্বোত্তম নেতা হবার জয়তিলক তার কপালেই পরানো দরকার।

মহীয়ান কর্মী :

কর্মী-যাপনই প্রকৃত শক্তি, এ প্রকল্প কোথায়? নিষ্কাম কর্মী ঈশ্বরের পুত্র, নেতার চাইতেও মহীয়ান। কর্মীরা গাছের শেকড়ের মতো। শেকড় বিস্তার না হলে গাছ যেমন বামন-বনসাই হয়, কর্মী-মূল স্বভাব-সক্রিয় না হলে নেতারাও পথে বসেন, জলের দরেও মতাদর্শ বিকোয় না। রাজনীতির উঠতি-পড়তির বাজারে ফুলচাষিদের মতোই তাদের অবস্থা হয়; হাটের পাশে খালের জলেই ফেলে আসতে হয় রাজনৈতিক মানবতা। প্রবল-প্রবুদ্ধ পথে পথে ফেরিওয়ালা হয়ে ফেরেন।

নেতৃত্ব আচরণে-আদেশে পথ দেখান— সুপথ অথবা কুপথ দুই-ই হতে পারে। কার্যকর্তারা নেতা হয়েও কর্মী-প্রতিভাত হয়ে দিশা দেখান। হয়তো কিছুটা প্রভেদ কার্যক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বোঝা গেলেও যেতে পারে। কিন্তু কখনো বোঝা যায় না, সংগঠনে 'কর্মী মাহাত্ম্য'-র মহোৎসব রয়েছে কিনা। বরং বোঝা যায়, তারা নেতৃ-সুখের বোড়ে, উদাস- উচ্ছিষ্ট-ভোজী জীব।

কিন্তু কর্মীদের মধ্যেও তো অনন্ত সম্ভাবনা, মহীরুহ হবার প্রভূত প্রবণতা! আমরা খুঁজে দেখি না; পাছে দাম দিতে হয়! না তার সহকর্মীদের দেখি, না নেতা, কার্যকর্তাদের দেখি। নিজেকে মহীয়ান করার চাইতেও মহত্ত্ব হলো কর্মীদের মধ্যে অবস্থান করে, কর্মী হয়েই কর্ম-যাপন করে প্রতিটি কর্মীকে মহৎ সংগঠনের জন্য অপরিহার্য করে তোলে। একেই বলে ব্যক্তি-নির্মাণ। চালকের আসনে বসে ব্যক্তি নির্মাণের ফরমান ধরিয়ে দেওয়া সোজা, কিন্তু তাদেরই একজন হয়ে সহকর্মীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করা কঠিন। যে কাজ যেভাবে করা দরকার, সেকাজ সেভাবে হয় না কেন? কারণ আমরা সংগঠনে চাইতে এসেছি, দিতে নয়। চাইবারও তো একটি প্রথা-প্রক্রিয়া আছে! 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে,/সিক্তচোখে যাসনে দ্বারে।।' আমারই যখন রাক্ষুসে ক্ষিদে, পীড়িতকে পিষ্টক দেবো কীভাবে? বরং চাইতে এলে পিঠে উত্তম-মধ্যম দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়! পরে অহৈতুকী জয়ধ্বনি শোনানো ছাড়া তারা আর কিছুই চায় না।

> “স্বামীজী বলেছেন, ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, অথচ হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। এখনও দেখা যাচ্ছে, মণ্ডল স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই একই রোগ।”

নেতা বা কার্যকর্তার বিজ্ঞাপনের সামগ্রী হতে কর্মীরা যে জগৎ-সংসারে অবতীর্ণ হননি, এই উপলব্ধির জাগরণ কোনোমতেই সংগঠন বিরোধী হতে পারে না। এই পন্থায় গণতান্ত্রিক অবয়ব বরং শক্তিশালী হয়, সাংগঠনিক প্রকৃষ্টতার জন্ম দেয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে সবার আগে হাতে-কলমে তা দেখিয়ে দিতে হবে। লোভী মানুষ একাজে সাফল্য পাবেন না। সম্ভাবনা আছে, নেতা বা কার্যকর্তার তরফে তা বাধা দেওয়ারও। কারণ রাজনীতিতে সবচাইতে বড়ো রোগ হচ্ছে, কর্মীদের সংগঠনমুখী না করে গোষ্ঠীমুখী বা ব্যক্তিমুখী করে তোলা। নেতার নামে জয়ধ্বনি বন্ধ হোক, তাদের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, পদ অলঙ্করণের বর্ষপূর্তি পালনও বন্ধ হোক। নেতাকে সঙ্গে করে সেল্ফি-মানস আমাদের সুপ্ত ইচ্ছেকে বেআব্রু করে দিয়েছে।

জীবনের খোঁজ কর্মময় জগতে কর্মীর খোঁজ, কর্মে উৎকর্ষতার খোঁজ যদি কোনো সংগঠনে না থাকে; কার্যকর্তা ও নেতার চির চাপান-উতোর হয়, তবে সিস্টেমে ভালো কর্মীর জন্ম হবে না।

গামছা ও চামচা :

ভারতীয় রাজনীতিতে সবসময় বহির্দলীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের চাইতে অন্তর্দলীয় সংগ্রাম অধিকতর কষ্টকর। বাহিরকে মতাদর্শ দিয়ে বাঁধ মানানো যায়, অন্দরের হিসেব সেই মতো চলে না। অন্তর্রাজনীতির শিক্ষাই তাই সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা, সেটা ঝঞ্ঝাটহীনভাবে কীভাবে দূরে সরাবেন, তার কৌশল অনেকের জানা থাকলেও প্রয়োগ করেন না

তারা। তাতেই সমস্যা গভীর হয়। সবচাইতে সমস্যা বাড়ায় নেতার চেয়ে 'কঞ্চি'-রা, যাদের বলা যায় 'গামছা নেতা'। শাড়ির মতোই, কিন্তু শাড়ি নয়, একেবারে ছোটো বহরের নেতা। নেতা রুষ্ট হয়ে যত না তেড়ে আসেন, গামছা মহোদয়/মহোদয়া তার চাইতেও আওয়াজ তোলেন বেশি। এই 'পরিকর বাহিনী' তৈরি করা থেকে নেতাকে বিরত করাতে হবে। এদেরই অধুনাতন নাম হলো 'সেলফি বাহিনী'। যারা সর্বদা নেতার সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন। কই, একজন মহীয়ান কর্মীর সঙ্গে ছবি তুলুন তো দেখি! মহীয়ান কর্মী কি আছেন? মহৎ কর্মী কি কেউ হতে চান? সবাই তো নেতা হতে চান। এত নেতা ধুনবে কে! এত তুলো ধুনবে কে!

উচ্চতর রাজনৈতিক অবস্থান :

আসলে রাজনীতিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাভের স্বপ্নই সমস্ত সম্পর্ককে হত্যা করে। নীচুতলার সম্পর্কে যতটা রক্তাক্ত, ততটাই উপরের উচ্চতাকে নিষ্কণ্টক করে তোলে। তাই বোধহয় অনেকেই হত্যার রাজনীতিকে বধ করতে প্রয়াস পান না। কোনো দলের কোনো 'অসাধু নেতা' যদি কোনো 'সাধু কর্মী'-র উপস্থিতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আধারে বিচার করেন, তখন অসাধু নেতার পরিবেষ্টিত সাধুকর্মীরা কিছু না বুঝেই তার দিকে তেড়ে আসেন ভীষণ রব করে। নিজস্ব বিচার বোধ আর থাকে না।

'সাধু নেতা' কোনো কারণে কোনো ক্ষমতাধর নব্য-নেতার চক্ষুশূল হলে, কেউ কি পরিমিতিবোধে তার পক্ষে এগিয়ে আসেন? আসা সম্ভব নয়। কারণ এক নিমেষে কেউ দীর্ঘদিনের লালিত্য-স্বপ্নকে চুরমার করতে চান না। প্রাপ্যের বেশি পেয়ে গেলে নেতার সহ্যশক্তিকেও সেই হারে বাড়াতে হয়, তবেই অধঃস্তরের কর্মীদের সঙ্গে মিলতে পারা যায়। নইলে সবটাই ফাঁক! রাজনীতির দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়ে যান।

মোহে চাকর রাখো জী :

মীরার মতো অনন্তকালে প্রসারিত সংগীত-ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল একদিন 'মোহে চাকর রাখো জী'। ভগবানের চাকর হতে চাওয়া, দূত হতে না চাওয়া, ফলের

অসংখ্য নেতার ভিড়ে আদর্শ নেতা, সত্য-সম্পর্কিত নেতা শনাক্তকরণ করা আজ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তেমনই কঠিন হলো, নিজেকে নেতৃত্বদানের যোগ্য করে তোলা।

আশা না করে নিষ্কাম কর্মের আশিস পেতে চাওয়ার প্রার্থনা কি রাজনীতিতে আছে? সেই ভগবানের চাকর যিনি, তিনি যোদ্ধা, তিনিও সুদর্শন চক্রে অনন্ত বিক্রম। ধর্ম যুদ্ধের প্রয়োজনে সমস্ত কাজ করেও চাকরের মতো নিজস্ব স্টাইলের কর্মী থাকতে পারা, দূতের মতো ফ্যাশন-দুরস্ত নেতা না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আজ কোথায়? ভগবান নেতাদের যেন তাঁর চাকর হবার বরমাল্য দেন।

আগে বঙ্গের ব্যায়ামের আখড়ায়, পাড়ার ক্লাবে, হিতবাদী সংগঠনে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'নবকুমার' তৈরি হতেন। তারা মানুষের বিপদে ছুটে যেতেন ত্বরিতগতিতে; নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। সমকালীন ক্লাবগুলিতে তারা অজন্মা, অধরা! কারণ নবকুমার তৈরির শাখায় প্রশাখা-পল্লব বিস্তার হতে দিইনি। কারণ নীতিশিক্ষা নেই। কিন্তু মানুষ ও সমাজের জন্য লোকহিত ওখানেই। স্বাবলম্বী ভারত তৈরির রসদও ওখানে।

নেতার প্রকারভেদ :

নেতা ত্রিবিধ— উত্তম, মধ্যম ও অধম; সে রাজনৈতিক নেতাই হোক আর সামাজিক-আধ্যাত্মিক নেতা! উত্তম নেতাকে দেশ, জাতি, কাল কম সময়ের জন্য পায়। তারা অনেকটা 'উসকো কাঠি'-র মতো; আমাদের চেতনায় কেবল অগ্নি প্রজ্বলন করতেই আসেন। আমাদের বোধের দোরগোড়ায় বাতিদান করে যান, চিন্তা-চেতনাকে ওলট-পালট করে যান এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়। উত্তমকে বেশি সময় বাঁধা যায় না, প্রয়োজনও হয়তো নেই। উত্তম নিজেও জানেন, তার কাজ ফুরোলে আর বিলম্ব নয়। পৃথিবী বরং মধ্যম নেতাদের পেয়েই সুখে থাকে। পৃথিবী গড়পড়তায় মধ্যম মানকেই চিরায়ত করতে চেয়েছে, হয়তো পেরেছে।

উত্তমের দ্যুতি সইতে পারার ক্ষমতা আমাদের নেই, সেই প্রবল ঝড় যদি একবার উৎস পায়, তা আটকানোর সাধ্যি নেই। মধ্যম নেতা তা ভালোভাবে জানে। সব প্রতিষ্ঠানেই উত্তমের রাজ্যাভিষেক এক বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। তাই বেহুঁশ হয়ে আমরা উত্তমকে নিত্য হত্যা করি, সততই গায়েব করি, তাকে অপ্রাসঙ্গিক করার সার্বিক চেষ্টায় রত হই। কিন্তু তার জ্যোতি এতটাই, তার স্বরূপ এতই চিরায়ত, তাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না; ঠিকরে বেরিয়ে আসে বলার্কপ্রভ-র মতো, ইতিহাসের অমল পাঠে তা বারবার ফিরে আসে।

মধ্যম নেতাকে নিয়েই মানুষ খুশি থাকে, মধ্যম তার মধ্যবিত্ত মানসিকতা দিয়ে মানুষের খুশির ভোল বদল করিয়ে নিতে জানে, জানে কখন উত্তমের নামে জয়ধ্বনি দিতে হয়, কখন উত্তমকে আচ্ছামতো গালমন্দ করে নিজের নোলা-সাম্রাজ্য বজায় রাখতে হয়। মধ্যম মানে হলো অধমকে ব্যবহারের অপূর্ব মুনশিয়ানা। পৃথিবী মধ্যমকে জয়ী করাতে চায় বলেই মধ্য-মেধার এত জৌলুশ! উত্তমের রয়েছে 'স্টাইল', একান্তই নিজস্ব, অমৃতের ঐশী চেতনা-সম্ভূত। মধ্যমের রয়েছে 'ফ্যাশন', যেন নিউমার্কেট থেকে কেনা বিদেশি পরবের সস্তা-পোশাক।

অধমকে চিরকাল মধ্যম নেতা 'ভর' করেছে, বেচারা বুঝতেও পারেনি, সে নেতা হবার যোগ্য নয়; মধ্যমান সংরক্ষণের সে এক ঐতিহাসিক 'বোড়ে'। অধমকে ব্যবহার করে মধ্যম উত্তমের বলিদান প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করেছে। তারই পারিতোষিক দেওয়ার প্রক্রিয়া জারি ইদানীং। অধমের বংশানুক্রমিক ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব নিয়েছে যেন!

মানুষের অনন্ত লোভ-মোহ-ইচ্ছে

মানুষকে উত্তম চেনার দুয়ারকে চিরকাল রুদ্ধ করে রেখেছে। মানুষ যতদিন না মধ্যমণিকে সোনার গোপাল বলে জড়িয়ে রাখবে ব্রজ-বালককে সে খুঁজে পাবে না। ভবের মাঝি, আমায় কী উত্তম নায়ে নিতে পারো না?

দলীয় কর্মী মহীয়ান তত্ত্বের কতিপয় দিক :

প্রতিটি দলীয় কর্মীর মর্যাদা বাড়াতেই হবে। কর্মী হওয়াও যে একটা গর্বের ব্যাপার, এটাও বুক ঠুকে বলুন প্রতিটি কর্মী। নেতা দেখলেই সেলফি তোলার বাতিক বন্ধ হওয়া উচিত। ছোটো-মেজো-বড়ো যাবতীয় দলীয় কার্যকর্তার জন্মদিন পালন করার মধ্যে তাদের দম্ভ বাড়তে পারে। 'নেতা'-র অন্তরে বোধ জন্মায় তিনিও একজন ছোটোখানো 'ঈশ্বর'। বিনা কারণে আলাদা করে কার্যকর্তার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বন্ধ করুন, তাতে অহেতুক দর্শনার্থীদের জন্য তাঁর সময় বরাদ্দ বাঁচবে, সেই সময়টি পরিকল্পনা রচনার জন্য তিনি দিতে পারবেন। কার্যকর্তাকে বুঝতে দিন, তিনিও আসলে হাতে-কলমে একজন সদর্থক কর্মী। দলীয় আবর্তিত চক্রে কারও পদ চলে গেলেও কর্মী হয়ে একশো শতাংশ কাজ করার মানসিকতা নিয়েই প্রতিটি কর্মী বা কার্যকর্তাকে চলতে হবে। ভোটের আগে অতি উৎসাহী নেতা-কর্মীদের একটি প্রবণতা থাকে, পরিস্থিতি অনুকূলে আছে এমন একটি অসত্য ভাব উপরে সম্প্রসারণ করে 'নেতা'-র চিত্ত জয় করা। অথচ বাস্তব আর কল্পনার আকাশ-পাতাল ফারাক। সেই মিথ্যার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করলে এবং আস্থা রাখলে ভুল হবে। কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে পারিষদবর্গের পরামর্শের বাইরেও খোঁজ নিন। মাটির সঙ্গে মিশুন কার্যকর্তা।

রাজনৈতিক শৈশবাবস্থা কাটিয়ে নিজেকে বের করে আনুন, তারপর কথা শুনবেন মানুষ। জনতার চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দিতে হলে নিজের মণিমাণিক্য, বাড়ানোর ধান্দাবাজি চলে না। সাইনবোর্ড-সম্মত নেতা নয়, ব্যাকরণ-সম্মত নেতা চাই— এই তো মানুষ জানিয়েই দিয়েছেন! 'আপন হতে বাহির হয়ে/বাইরে দাঁড়া।/বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসবেন না। বেদনা পুড়িয়ে পঞ্চভূতে লীন করে ময়দানে নামুন।

অলির কথা শুনে :

ছোটোবেলায় যখন মৌমাছি সম্পর্কে প্রথম পড়লাম, শ্রমিক মৌমাছিই আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল। 'ওরা কাজ করে দেশে দেশান্তরে।' সাহিত্যে সংগীতে যত অলির কথা পেয়েছি, সবই শ্রমিক মৌমাছিদের পক্ষ-সঞ্চালন। নেতা নয়, কার্যকর্তা নয়, আধিকারিক নয়, মন্ত্রী নয়— কোনো এক শ্রমিকের বোধ আমার মধ্যে বাসা বাঁধে। অফুরান ভালোবাসায়। ছোটো ছোটো মানুষের ছোটো ছোটো আশা, তাদের অপরিসীম সংগ্রাম, তাদের বিনীত দেশভক্তি আমি দেখেছি। দেখেছি তাদের বালি-মাখা গা অথবা চাল-ধোওয়া হাত। আমার মন নিমেষে পূজা দিয়েছে বিশ্বকর্মার মূর্তি কল্পনায়। সবই অলির কথা শুনে—

কোটি কোটি বাঙ্গালিরে হে মুগ্ধ সেনানি
রেখেছো অনুগামী করে, সদস্য বনোনি।

ফেসবুক-বন্ধুমহলে হতাশার পাহাড়, কারণ তাদের অধিকাংশই ব্যক্তিপূজায়, নেতৃপূজায় সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রসাদ ও বাহবার তাগিদে যাবতীয় কৃতকর্মের ও অহংকারের শরিক হয়েছেন, তাই তাদের পলায়নপর-মানসিকতায় 'আহত' হয়েছেন। তা না করে, তারা যদি প্রথমাবধি সংগঠন-পূজা করতেন, সংগঠনের আদর্শ ও পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন, তাহলে এত 'ভেঙে' পড়তেন না তারা। আর সত্যিই কী তারা ভেঙে পড়েছেন? তারাও কী অনুগমন করবেন? সেটি কোটি টাকার প্রশ্ন; এখন কুলুঙ্গিতে তোলা থাক। যদি মতাদর্শ ও সংগঠন বুঝতেন তারা, তবে এটা বুঝতে সমর্থ্য হতেন যে, তার মাননীয় নেতা কোন পথের শরিক, কোন উদ্দেশ্যে ভ্রমণরত। 'নেতা'-কে সবসময় অনুগামী তৈরি করতেই দেখা যায়, কিন্তু 'কার্যকর্তা'-রা নির্মাণ করেন দলীয় সদস্য। কার্যকর্তারা বেদের সংগঠন মন্ত্র অনুসরণ করে চলেন।

সংগঠনে সদস্যের বদলে অনুগামী কেন নির্মিত হয়েছিল, এই প্রশ্ন তোলা আজ বাতুলতা। কিন্তু ঘটনাই সত্য, ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। নেতা তখনই 'সংস্কারিত' হতে বাধ্য হন, যখন তার যাবতীয় অনুগামী সংস্কারিত হবার বাসনা নিয়ে বসে থাকেন। নেতার যাবতীয় দায় তাই কর্মীদের ওপরও বর্তায়, কর্মীরা তা এড়িয়ে যেতে পারেন না। বলিষ্ঠ কর্মী সংগঠনের প্রাণ, কিন্তু তাদের পৌনঃপুনিক লঘু আচরণে নেতারা 'দশচক্রে ভূত' হয়ে যান। তাই বলতে হয়— কোটি কোটি বাঙ্গালিরে হে মুগ্ধ সেনানি/রেখেছো অনুগামী করে, সদস্য বনোনি।

ভারতীয় নেতার সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য :

স্বামীজী বলেছেন, ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, অথচ হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। এখনও দেখা যাচ্ছে, মণ্ডল স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই একই রোগ। তার থেকেও বড়ো রোগ নিজে নেতা হয়েছি— তা অন্যকে প্রাণ ভরে দেখাতে হবে, অন্যের বসার জায়গা যথাসম্ভব ছোটো করে দিতে হবে। নতুন পে-কমিশন লাগু হলে যে মনস্তত্ত্ব কাজ করে, তা হলো আমি নিজে বেতন কেবল বেশি পাবো তাই নয়, অন্যে আমার চাইতে বেতন কম পাবেন; তবেই না বেতন বৃদ্ধিতে আমি খুশি হবো! নিজে নেতা হয়ে অন্যকে ছোটো চেয়ার দেওয়ার রোগও একই রকম। নিজে 'গ্রেট' কিনা বড়ো কথা নয়, কিন্তু নিজেকে 'গ্রেট' হিসাবে দেখাতে হবে। এটা হলো 'ইমেজ ব্রিডিং ডিজিজ'। নেতাকে পরিপূর্ণরূপে তুষ্ট করার একমাত্র উপায় হলো, তার যত না বড়ো চেয়ার পাওয়ার আছে, তার চাইতেও তাকে বড়ো আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

স্বঘোষিত, মনোনীত, নির্বাচিত ও লুণ্ঠিত— অসংখ্য নেতার ভিড়ে আদর্শ নেতা, সত্য-সম্পর্কিত নেতা শনাক্তকরণ করা আজ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তেমনই কঠিন হলো, নিজেকে নেতৃত্বদানের যোগ্য করে তোলা। নেতা হওয়ার বিষয়ে স্বামীজীর কিছু অনুভব এ প্রসঙ্গে পরিবেশন করা হলো। ভারতবাসীর এক অন্যতম সেরা, চিরকালীন নেতা তিনি; ভারতবর্ষের শাশ্বত এক যুবনেতা। □

কয়েক শতাব্দীর এক পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলতে শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তারা তেত্রিশ আর ভারতে সতেরো শতাংশ। সংখ্যালঘুরা দ্রুত একদিন যেভাবেই হোক সংখ্যাগুরু হবে। একজন রাজনৈতিক নেতা তথা মন্ত্রীর মুখে কী মারাত্মক জেহাদি উসকানি, সাম্প্রদায়িক বিভাজন! এর আগেও একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলতে শোনা গিয়েছিল— 'যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে ইমান নিয়ে আসতে হবে এবং এই কাজ করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে, খুশি হবেন আল্লাতালাও।' না, তিনি কোনো ধর্মগুরু নন, তিনি রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা বর্তমান কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা মুখ্যমন্ত্রীর সবচাইতে কাছের লোক তথা জনপ্রতিনিধি। মেয়র বা মন্ত্রী পদে শপথ নেবার সময় সংবিধান নির্দেশিত সমস্ত আইন-কানুন মেনে যে অঙ্গীকার করে রাজধর্ম পালন করবেন বলে শপথ নিয়েছিলেন এটা তারই এক আশ্চর্য প্রতিফলন। অর্থাৎ হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসি ইহুদি হয়ে জন্মানোটা ওর সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্ভাগ্য বা অপরাধ। আর এই অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে ওর মজহবে নাম লেখাতে হবে, আর ওর মজহবের যেসব লোকজন এই কাজটি করতে পারবেন তারা জান্নাতে যাবেন। 'সংখ্যালঘুরাই একদিন সংখ্যাগুরু হবে', কী ভয়ংকর ফরমান, কী সাঙ্ঘাতিক স্পর্ধা! কী অর্বাচীন মতবাদ! কার হাতে কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক দায়িত্ব!

না, মাথা খারাপ বা আবেগপ্রবণ হিসেবে ভাববেন না। একদম সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ব্লুপ্রিন্ট। এটা মাঝে মধ্যেই তিনি ঝালিয়ে নেন, কখনো 'মিনি পাকিস্তান' করে দেবার কথা বলেন, তো কখনো অর্ধেক বাঙ্গালি একদিন উর্দু ভাষায় কথা বলবেন এই ভয় দেখান আর এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করতে চাইছে। আবার তাঁর দলের চোপরার বিধায়ক হামিদুল রহমান মুসলমান দেশগুলির বিচার বিভাগীয় যে আইনের উপমা দিলেন, কিংবা সম্প্রতি লোকসভা ভোট চলাকালীন মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবির হুংকার দিয়ে তিরিশ শতাংশ হিন্দুকে দু' ঘণ্টার মধ্যে মেরে ভাগীরথীর জলে ফেলে দেবার হুংকার দিলেন, কিছুদিন আগে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সিদ্দিকুল্লা বললেন হাম দো হামারা দো নয়, হামারা চার। সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু বানানোর নিদানের ক্ষেত্রে সিদ্দিকুল্লা, হুমায়ুন কবিরের দেখানো পথেই হাঁটছেন রাজ্যের গুণধর মেয়র তথা মন্ত্রী ববি হাকিম। অথচ দলের পক্ষ থেকে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতেও হয়নি।

কারণ এই শতাংশের ভোটেই রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব টিকে থাকে। ভাগ্য ভালো যে এহেন আক্রমণাত্মক নিদানের বিরুদ্ধে আর যাই হোক, ভারতবর্ষে কোনো হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের কোথাও এর প্রতিবাদে সমস্ত হিন্দু এককাট্টা হয়ে একটা টায়ারও জ্বালায়নি, একটা বাসও পোড়ায়নি, কোথাও রেললাইন উপড়ে ফেলা অথবা যাত্রীদের পাথর ছোঁড়া হয়নি, একটা দোকান ঘরে কেউ অগ্নি সংযোগ ঘটায়নি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো পথ অবরোধ করে অসহায় যাত্রীদের হয়রানি করা হয়নি। হিন্দু অনেক বেশি সংযমের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে এখনো। দুর্ভাগ্যের কথা বলছেন হাকিম সাহেব? এই দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হয়েছেন, দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেই একটা স্বামী বিবেকানন্দ তৈরি হয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন, জয়দেব লিখছেন গীতগোবিন্দ, মধুসূদন জন্ম দিয়েছেন একটা ছন্দের, অরবিন্দ হয়েছেন মহর্ষি। হিন্দুরা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে বলেই আপনি এখনো সৌভাগ্যবান সুরক্ষিত। কোন খেলা খেলতে চাইছেন জনাব? সনাতনী হিন্দুর সহনশীলতা, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এতটাই উচ্চ মার্গে বিচরণ করছে যে সেখানে আপনার মতো জেহাদি জিগির তোলা, কোনো প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাবাদী শক্তি হিন্দু পুণ্যাত্মাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

হাকিম সাহেবের মতো কিছু ঘোর সংকীর্ণতাবাদে বিশ্বাসী এই সব রাজনৈতিক দলের মানুষজন সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে 'হিন্দু' শব্দের অন্তর্দৃষ্টিকে পরিকল্পিতভাবে বিপথগামিতায় প্রতিষ্ঠিত করার মরিয়া প্রয়াস সৃষ্টি করেছেন। জানেন, কারা হিন্দু? এরা এলই-বা কোথা থেকে, কী এদের পরিচয়, আগে দেশের ইতিহাস সভ্যতা সংস্কৃতি জানতে হয়। আসলে হিন্দু শব্দটির

উৎসগত অর্থ হলো, 'হীনং দূষয়তি স হিন্দুঃ অথবা হীনং দুরয়তি স হিন্দুঃ। অর্থ হলো, হীনতা'কে যে বর্জন করে সেই হিন্দু। হিন্দু কোন সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ শব্দ নয় জনাব এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশ্ববন্দিত অনতিক্রম্য এক শাশ্বত মূল্যবান সৌভ্রাতৃত্ববোধ, যে বিশ্বমেকনীড়ম, যে বসুধৈবকুটম্বকম্। স্বামী বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন মহান এই শব্দের কী সীমাহীন গভীরতা, কী অনন্ত প্রসারতা এবং কালজয়ী তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোৎনা।

হিন্দু মনীষীদের সম্বন্ধে অধ্যাপক 'ম্যাক্সমুলার' বলেছিলেন যে, 'তাঁহারা এত উচ্চে উঠিয়াছেন যে, সেখানে তাঁহাদের ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অপর দার্শনিকগণের ফুসফুস ফাটিয়া যাইত। হিন্দু হলো প্রবক্তা নিরপেক্ষ, সম্প্রদায় বর্জিত, শাশ্বত সনাতন ও অপৌরষেয়, অনাদি, সর্বগ্রাহী, গণ্ডী ভাঙা এক চিরন্তন সত্যের বাকে, সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দিব্য গুণাবলী সম্পন্ন এক তাৎপর্যপূর্ণ দ্যোতনা। হিন্দু কোনো সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই পবিত্র এই সনাতন সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজনীন ও বিশ্ববন্দিত। বিশ্বজনীন কারণ, হিন্দুত্ব সর্বসমাবেশক। এতটাই প্রাচীন যে জগৎ সংসারে হিন্দু ধর্মকে সনাতন বলা হয়।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও সংস্কারের পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটেছে। জন্ম হয়েছে সার্বভৌম ও স্বতন্ত্র সত্তা সংবলিত প্রতিষ্ঠিত সত্য। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ধর্ম-পন্থ, একক প্রবক্তার আদর্শ ও ধর্মমার্গ— শিখ, বৈদিক, শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব। এই সব ধর্মমার্গ বিশ্বাস করে নিজ নিজ সৃষ্ট ইষ্টদেবতাকে, তথাপি প্রতি মুহূর্তেই সৃষ্ট নতুন ধর্মমার্গ হিন্দুত্বের মূল স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে ক্রমাগত পুষ্ট করে চলেছে।

এই সনাতন হিন্দুজাতি এত ঠুনকো নয় যে ফিরহাদের মতো একটা অর্ধশিক্ষিত লোকের কথায় হিংসাত্মক কার্যকলাপে মনোনিবেশ করবে। এই উসকানি যদি উলটো হতো তাহলে কী হতো? কিংবা যদি এই নিদান যাদের দেওয়া হয়েছে তারা যদি উৎসাহিত হয়ে জান্নাতের আশায় হিন্দুদের ধরে ধরে ধর্মান্তরণের জন্য পথে নেমে পড়ত কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, মহারাষ্ট্রের অলিতে গলিতে, তাহলে নিশ্চিতভাবে ১৯৪৬ সাল ফিরে আসত

আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি ভুলে গেছে নজরুলের প্রায় দুশো গানে সুরারোপ করা চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সেই অবিস্মরণীয় সুরকার কমল দাশগুপ্ত থেকে কামালউদ্দিন হওয়ার করুণ ইতিহাস ও শেষ পরিণতি।

ভারতের বুকে। বিষয়টি পরিষ্কার করে বোঝার সময় এসে গেছে। আগামীদিনে হিন্দু অস্তিত্ব কতটা সুরক্ষিত থাকবে এরকম লোক প্রশাসনে থাকলে? বলে রাখা ভালো যে এটা কোনো প্রথম মতবাদ নয়, এটা বর্তমানে তাঁর রাজনৈতিক পূর্বসূরিদের শেখানো বুলি, তিনি আওড়ে যাচ্ছেন। তিনি নতুন কিছু বলেননি। সেদিন ছিল সোহরাবর্দি, ওসমান আর আজ ফিরহাদ হাকিম।

যে আশা সৈয়দ আহমদের ছিল, ইকবালের ছিল, জিন্না এমনকী তথাকথিত বঙ্গবন্ধু বলে সমাদৃত মুজিবুর রহমানের মধ্যেও ছিল অর্থাৎ ইসলামীকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ চাইই-চাই। এটা তাদের কোনো সংযোজিত নতুন তথ্য নয়, শুধু তাদের উত্তরসূরি বিদেহী আত্মাদের অতৃপ্ত বাসনাগুলো মিটিয়ে একটা স্বাধীন মুসলমান দেশ তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি করতে চাইছেন। কারণ যে দলটির ফিরহাদ হাকিম প্রাণভোমরা হয়ে আছেন, নিশ্চিতভাবে তাদেরও আপত্তি থাকার কথা নয়। আর করবেনই-বা কেন, পারতপক্ষে ওর দল হয় এই কথাগুলোর মান্যতা দিয়েছেন, নতুবা তাঁরা যারা হিন্দু নেতানেত্রী তারা অন্তত ওর কথাটা মেনে নিয়েছেন, মেনে নিয়েছেন হিন্দু পূর্বপুরুষ, সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত, ঋষি মহর্ষি, হিন্দু রাজা-মহারাজা আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত জ্ঞানীগুনিজন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা-মা, সাধক ব্যামাক্ষ্যাপা, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এরা সবাই দুর্ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিলেন।

হিন্দুরা তো এটাই ভাবছেন যে ওরা পাগলের মতো বকছে, আমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, কাঁধে শান্তিনিকেতনের ব্যাগ ঝুলিয়ে কাব্য চর্চা করতে করতে কী সুন্দর সেকুলারিজমের রাজনীতি করি। আমরা গান্ধীর অর্ধসত্য বাণী 'অহিংসা পরম ধর্ম' মেনে চলি, আমরা ধর্ম-ধর্ম করি না, জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই করি, আরে বাবা ও এটা ভুল করে হয়তো বলে ফেলেছে, তাতেই নিন্দুকেরা গেল গেল রব তুলে ফেলেছে...।' কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি ভুলে গেছে নজরুলের প্রায় দুশো গানে সুরারোপ করা চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সেই অবিস্মরণীয় সুরকার কমল দাশগুপ্ত থেকে কামালউদ্দিন হওয়ার করুণ ইতিহাস ও শেষ পরিণতি। আবার পূর্ববঙ্গ থেকে ঘাড় ধাক্কা খাওয়া, ভিটেমাটি ছেড়ে এক কাপড়ে সম্পত্তি ফেলে আসা দাঁড়ে পোষা বুদ্ধিজীবী যারা ক্রীতদাসের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে শাসকের শেখানো নামতা পড়ে। 'ক্যা ক্যা, ছি! ছি!'

কী বিচিত্র হিন্দুরা আটশো বছরের গোলামি সহ্য করেও হিন্দু জাতিটার কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলো না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুরা বরাবরই ইতিহাস বিস্মৃত বৈচিত্র্যময় এক উদাসীন জাতি। তারা আজ বিস্মৃত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নি সংযোগের ইতিহাস, বিস্মৃত নবাব বাহাদুর দ্বারা হাজার হাজার হিন্দু মঠ-মন্দির ধ্বংসের ইতিহাস, বিস্মৃত শত সহস্র হিন্দু রমণীর সতীত্ব হানির ইতিহাস, বিস্মৃত লক্ষ হিন্দু নরনারীর বলপূর্বক ধর্মান্তরণের ইতিহাস। বিস্মৃত ১৯৪৬-এর নোয়াখালি কিংবা কলকাতা হিন্দু নরসংহারের ইতিহাস। গোপাল মুখোপাধ্যায় বা নির্মল চট্টোপাধ্যায়ারের মতো লোক যদি ওই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতেন, গোটা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে হয়তো হারাতে হতো। সংবিধান কাজ করবে না হাকিমের স্বপ্ন সফল হলে, এখন যেমন বাংলাদেশে চলছে। যে হাতে পবিত্র সংবিধান ছুঁয়ে ফিরহাদ দেশ সেবা করবার শপথ নিয়েছিলেন, জনগণকে সুরক্ষা দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আজ সেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন জনাব। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা শুধু ভাতা বা ভাণ্ডারের জন্য জনাবের দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করে যাচ্ছেন— এটাই আশ্চর্যের। □

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

স্বামী বিবেকানন্দের ছিল আধুনিক প্রজ্ঞা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ, মোহহীন পর্যবেক্ষণ। শক্তি ছিল তাঁর উপাস্য। কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় গলাবাজিকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, ‘‘ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামিছি হইচই করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ে লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি কাজ হয়? বলুক, নিজেদের ইন্ডিপেন্ট বলে ডিক্লিয়ার করুক, হেঁকে বলুক, ‘আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম’...কেবল কি গলাবাজিতে কাজ হয়? বিধিমতে কাজ করে যাব, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।’’

স্বামীজী স্পষ্ট বক্তা। নির্ভীক, বাস্তববাদী। স্বাধীনতা পেতে গেলে প্রথমে কী করতে হবে তিনি পথ নির্দেশ দিলেন— দরিদ্র মানুষকে পেটপুরে আগে খেতে দিতে হবে। তারা যে মানুষ এই বোধ আগে জাগাতে হবে। ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থেই বিশ্বজুড়ে সুচতুরভাবে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছে যে ভারতবর্ষ নির্জীব, ভারতবাসীরা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ইংরেজরাই তাদের আলোর সন্ধান দিচ্ছে। তাই দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে দরকার বিদেশে এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য তুলে ধরা। ‘সাইক্লোনিক মঙ্ক’ বিবেকানন্দ নিজেই সে কাজ শুরু করেছিলেন। পরাধীন ভারতবাসীকে শোনালেন ‘আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হন।’

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ‘ভারতীয়’ বোধ মোটেই সক্রিয় ছিল না। বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিচয়ই প্রাধান্য পেত। শিকাগো ধর্মসভায় বিশ্ব বিজয়ের মধ্য দিয়েই ভারতীয়ত্বের যাত্রা শুরু হয়। তিনি নিছক হিন্দু সন্ন্যাসী না হয়ে ভারতীয় বোধের অনির্বাণ জ্যোতি হয়ে উঠলেন। গোটা দেশ পরিব্রাজন করে স্বামীজী বুঝেছিলেন, ‘ভারতের ভবিষ্যৎ জাতির জন্ম হইবে দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের কুটিরে।’ জাতীয়তাবোধের স্বরূপ কেমন? শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন সনাতন ধর্মই হলো জাতীয়তা। স্বামীজী যে জাতীয়তার কথা বলেন সেখানে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। মার্কসবাদী নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করতেন

স্বামীজী আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রবোধের স্রষ্টা যা তীব্র এক জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। তারই ফলস্বরূপ গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দেবার শক্তি ধরে।

কিন্তু সবার আগে দরকার ক্ষাত্রশক্তি। বেদান্তের 'অভীঃ' ও রুদ্র কালীমাতা তাঁর আরাধ্য। লক্ষণীয়, বিপ্লবীরা বেশিরভাগ ছিলেন মা কালীর ভক্ত। সুভাষচন্দ্র মা কালীর পূজার ফুল সঙ্গে রাখতেন।

হিন্দু ঐতিহ্য ভারতকে সঙ্কট অতিক্রমে সহায়তা করেছে। স্বামীজী বর্ণিত 'mild Hindu' বা বিনম্র হিন্দুজাতি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের প্রবল অত্যাচার ও বিরোধিতা সত্ত্বেও যে টিকে আছে তার কারণ নিজের ঐতিহ্য ও সনাতন রীতির প্রতি শ্রদ্ধা। আর এই সনাতন রীতিই হলো তার অন্তর্নিহিত জাতীয়তাবোধ। হিন্দুধর্ম মুক্তি ও আধ্যাত্মিক যে স্বাধীনতার কথা বলে তার মধ্যেই নিহিত আছে তার বেঁচে থাকার চাবিকাঠি। তাঁর কথায় 'ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'

হিন্দু জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্বের' প্রভাবে ও স্বামীজীর অগ্নিপ্রভ বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গের প্রথম বিপ্লব কেন্দ্র 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মার্চ, দোলপূর্ণিমার দিন। বরোদায় অবস্থানরত অরবিন্দ বঙ্গে বিপ্লবপন্থা প্রচারের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হতে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনুজ বারীন্দ্রকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর প্রভাব বিপ্লবীদের কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার উল্লেখ বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় করেছেন, 'রাজনীতির আত্মদানমূলক আন্দোলনকে গোড়ার দিকটায় তিনি ছেয়ে ছিলেন। ...বহুদিন পর্যন্ত স্বামীজীর প্রভাব বঙ্গের রাজনীতিতে ছিল।'

স্বামীজী এতো উন্নত দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ছিলেন নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, মেধা ও ইতিহাসবোধের জন্য। রাজা রামমোহন রায় যে সংকীর্ণতামুক্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ ছিল আন্তর্জাতিকতাবোধ। ভুবনজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তাই যথার্থই বলেছিলেন, 'আমাদের পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই...যেদিন হইতে রাজা রামমোহন রায় সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেইদিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।'

স্বামীজী পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিদেশে গিয়ে দেখেছেন অন্য জাতিগুলির ক্রিয়াকলাপ। সেই জাড্য তাঁকে প্রাণিত করেছে। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে মার্গারেট নোবেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এই আইরিশ কন্যা পরে হলেন তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজীর ভাষ্য। ভারতীয় বিপ্লবকাজে নিবেদিতার অবদান সুউচ্চ। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নিবেদিতা ছিলেন বিপ্লবকর্মে আস্থাশীল। নিবেদিতার প্রতি তাঁর গুরুর নির্দেশ ছিল, 'তুমি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামতো চল, নিজের কর্ম বাছিয়া লও।'

স্বামীজীর অনুজ ভূপেন্দ্রনাথ ভগিনী ক্রিস্টিনের কাছে শুনেছিলেন স্বামীজীর বৈপ্লবিক প্রয়াস। ক্রিস্টিন জানিয়েছেন স্বামীজী দেশীয় রাজন্যবর্গকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বিপ্লবের জন্য। স্বামীজী রাইফেল নির্মাতা হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন যাতে বন্দুক পেতে অসুবিধা না হয়। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দেশ এখনো বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়। তাই বন্দুক সংগ্রহ থেকে সরে আসেন। স্বামীজী ভারত পরিভ্রমণের সময় দেশীয় রাজন্যবর্গের আতিথ্য নিতেন তাঁদের মনে দেশপ্রেম সৃষ্টির জন্যই।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা হয় যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন। প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সে কাজের ভার দিয়ে যান।'

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা হয় যে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন। প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সে কাজের ভার দিয়ে যান।'

গীতার উন্নত দর্শন, সনাতন ধর্মবোধ এদেশকে বার বার বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। স্বামীজী সশ্রদ্ধ চিত্তে তাই বলেন, 'সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী মুঘল শাসনের দক্ষিণ বিজয় যখন প্রায় সমাপ্তির মুখে, ঠিক তখনই সেই ভূখণ্ডের পার্বত্য প্রদেশ হইতে, মালভূমির নানা প্রান্ত হইতে কৃষকগণ অশ্বারোহীর ছদ্মবেশে দলে দলে, কাতারে কাতারে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। রামদাস প্রচারিত, তুকারাম সমুদ্গীত ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য নামমাত্র পর্যবসিত হইল।'

স্বামীজী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বা গুরু গোবিন্দ সিংহের শক্তির প্রতি বার বার শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন। উন্নতশীর্ষ এই সন্ন্যাসীই ছিলেন নেতাজীর আদর্শ মহামানব। স্বামীজী বলেছিলেন, 'তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। অগ্রসর হও... পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে।'

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের উদাত্তস্বরে বললেন, 'রক্তের ডাকে এসেছে। ওঠো জাগো। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। অস্ত্র হাতে তুলে নাও। শত্রু সৈন্যের সারিবদ্ধ ব্যূহ ভেদ করে আমরা আমাদের পথ করে নেব। আর যদি ঈশ্বর চান, আমরা বীরগতির মৃত্যুবরণ করব।' নেতাজীর এই আহ্বানের পটভূমিতে রয়েছে স্বামীজীর সুবিপুল প্রভাব।

সে সময় প্রায় সব বিপ্লবীর বাড়িতে থাকত স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। পুলিসি তল্লাশিতে বিপ্লবীদের বাড়িতে পাওয়া যেত স্বামীজীর বই। তাঁর প্রয়াণের পর প্রভাব আরও সর্বব্যাপী হয়। সারদা মা স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাই বলেছিলেন, 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত।' □

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী

সুতপা বসাক ভড়

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশমন্ত্রে বলেছেন— ‘ ‘হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার উপাস্য সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।”

সীতা সম্বন্ধে বললেন,— “...সীতার কথা কী বলিব ! তোমরা জগতের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া নিঃশেষ করিতে পারো, জগতের ভাবী সাহিত্যসমূহও নিঃশেষ করিতে পারো, কিন্তু তোমাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে আর একটি সীতার চরিত্র বাহির করিতে পারিবে না। সীতাচরিত্র অসাধারণ; ওই চরিত্র একবারই চিত্রিত হইয়াছে, আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। রাম হয়তো কয়েকটি হইয়াছেন; কিন্তু সীতা আর হন নাই। ভারতীয় নারীদের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারীচরিত্রের যতপ্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা চরিত্র হইতেই উদ্ভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতর; সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। ...ভারতীয়দের মর্মস্থলে সীতার আসন চিরন্তন। আমরা সকলে সীতারই সন্তান, কারণ প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর রক্তে সীতার আদর্শ প্রবহমান। আমরা দেখতে পাই, ভারতীয় নারীদের সীতার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া আধুনিক করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু তাহা কখনো সফল হইবে না। ভারতীয় মেয়েদের সীতার আদর্শে গড়ে ওঠা এবং সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করাই একমাত্র উপায়।”

শিক্ষা থেকে আয়ত্ত চারটি গুণ— জ্ঞান, শক্তি, নির্ভীকতা, ঔদার্য ও মমতা এবং বাস্তব দক্ষতা। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে সঠিক শিক্ষা পেলেই ভারতীয় নারীরা তাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে। আবার তিনি বলেছেন যে, শিক্ষা কেবলমাত্র লোকায়ত হতে পারে না, শিক্ষা হতে হবে আধ্যাত্মিক। এই শিক্ষায় অর্থোপার্জনকে অবেহলা করা হয়নি, বরং এই সর্বতোমুখী শিক্ষার মধ্যে এর একটি আংশিক কিন্তু নিশ্চিত স্থান আছে। এই প্রকার শিক্ষা কখনোই প্রথাগত বিদ্যালয়-নির্ভর শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। এই শিক্ষা স্থায়ী হয় জীবনব্যাপী।

স্বামীজীর মতে নারী হলেন জাতির মাতৃস্বরূপা, সেজন্য নৈতিকভাবে তাঁদের দৃঢ়চরিত্রসম্পন্না ও নির্ভীক হতে হবে। একজন ভীরুতাসম্পন্ন মা কখনোই তাঁর সন্তানদের মহত্ত্বের পথে অনুপ্রাণিত করতে পারেন না। যেখানে জ্ঞান অনুপস্থিত, সেখানেই ভীতির উপস্থিতি হয়। একজন অশিক্ষিতা মায়ের সন্তান অসুস্থ হলে মা জানেন না, কী করা প্রয়োজন, ফলে তিনি হয়ে পড়েন ভীত ও বিচলিত; অথচ শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি তাঁর সামান্য জ্ঞান থাকত, তাহলে তিনি শিশুটির কষ্টের কারণ বুঝতে পারতেন এবং শান্তভাবে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতে পারতেন। সমগ্র বিশ্বের পরিচালনার ন্যূনতম পদ্ধতিগুলির জ্ঞান থাকলেই আসে নির্ভীকতা, কারণ জ্ঞানই হলো শক্তি। আবার আরও বেশি নির্ভীকতা আসে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান থেকে।

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করলে আমরা নির্ভীকতার চূড়ান্ত ধারণায় পৌঁছাতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে ভীতি নেই এবং যেখানে ভীতি নেই সেখানে কোনো অন্ধবিশ্বাসও থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেন, যেখানে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক হবে। তিনি বলেছেন, আগামী যুগের স্ত্রীর মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ থাকবে। পবিত্র শান্তি ও স্বাধীনতার পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য থেকে উদ্ভূতা হয়েছেন, তাই হলো আদর্শ অবস্থা।

স্বামীজীর মতে নারীকে প্রথমে সমাজের আদর্শগুলি নতশিরে গ্রহণ করতে হবে, তারপর যতই তাঁরা আরও বেশি গুণশালিনী হতে থাকবেন, ততই তাঁরা জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্দেশ ও সুযোগগুলি ভালো করে বুঝতে পারবেন। ওইসকল কর্তব্য পালন করে এবং ওইসকল সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, তাঁরা ক্রমশ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি ভারতীয় ভাবাপন্ন হবেন এবং উন্নতির এমন উচ্চশিখরে আরোহণ করবেন, যা প্রাচীন ভারত কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। □

মানব শরীরে থাইরয়েডের প্রভাব

ডাঃ বলরাম পাল

থাইরয়েড হলো এক প্রকার অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি যা গলার সামনের দিকে বা গ্রীবাতে অবস্থান করে। এটি অনেকটা প্রজাপতি আকৃতির। এর দুটি লোব বা লতি দু'দিকে অবস্থান করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে রস নিঃসৃত হয় তাকে থাইরয়েড হরমোন বলা হয়। থাইরয়েডের কারণে মূলত তিন প্রকার সমস্যা হয়। রক্তে থাইরয়েড হরমোন যদি কম উৎপন্ন হয় তখন তাকে হাইপোথাইরয়েডিজম বলে, আবার যদি বেশি উৎপন্ন হয় বা রক্তে যদি এই হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন তাকে হাইপারথাইরয়েডিজম বা থাইরোটক্সিকোসিস বলা হয়। আবার থাইরয়েড গ্রন্থির প্রধান কাজ হলো আয়োডিন সংবলিত হরমোন তৈরি করা। আয়োডিনের অভাবে Triiodothyronine (T3) ও Thyroxine (T4)-এর উৎপাদন কমে যায় ফলত থাইরয়েড গ্রন্থি বড়ো হয়ে গলগণ্ড রোগ সৃষ্টি করে। আয়োডিনের স্বল্পতা ছাড়াও হাইপোথ্যালামাস বা পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিসৃত থাইরয়েড স্টিম্যুলেটিং হরমোনের (TSH) স্বল্পতাও এই রোগের কারণ হতে পারে।

থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য আয়োডিন লাগে, আয়োডিনের অভাবই হাইপোথাইরয়েডিজমের সর্বপ্রধান কারণ। সাধারণ জনসংখ্যার প্রায় তিন শতাংশ মানুষ খাবারে আয়োডিনের অভাবে হাইপোথাইরয়েডিজমের শিকার।

হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণ :

● রোগী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না, শরীরে ঘামের পরিমাণ হ্রাস পায়, ত্বকের শুস্কতা বৃদ্ধির কারণে চুলকানি অনুভূত হয়।

● পেশিতে হালকা ব্যথা বা ক্রাম্প এবং পেশি শৈথিল্যের কারণে অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হতে পারে।

● হাইপোথাইরয়েডিজমে একটি বড়ো লক্ষণ হলো ওজন বৃদ্ধি। এই সমস্যায় গলগণ্ড থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

● ভঙ্গুর আঙ্গুলের নখ, ভঙ্গুর চুল, বেশি চুল পড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য এইসব লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে রজঃস্রাব বৃদ্ধি পেতে পারে।

● স্বর ভেঙে গিয়ে ভারী হয়ে যায় ফলে কথা ধীরে ধীরে বলতে হয়।

হাইপারথাইরয়েডিজম লক্ষণ :

হাইপারথাইরয়েডিজমের সূত্রপাত সাধারণত ধীরে ধীরে হয় এবং এর প্রভাবে হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা শুরু হতে পারে।

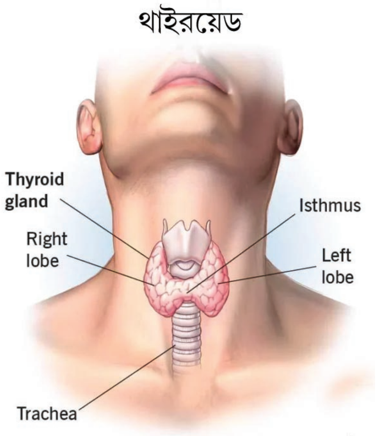

● হৃদযন্ত্র বা কার্ডিওভাসকুলার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি (Tachycardia), অনিয়মিত হৃদযন্ত্রের ছন্দ, বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।

● স্নায়ুতন্ত্র বা নিউরোমাসকুলার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে নার্ভাসনেস, হাইপার অ্যাক্টিভিটি বা অস্থিরতা, উদ্বেগ ও বিরক্তি, অনিদ্রা, কাঁপুনি ও পেশি দুর্বলতা।

● হাইপারথাইরয়েডিজমের অন্যতম বড়ো উপসর্গ হলো ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং ভালো খাওয়া দাওয়া সত্ত্বেও ওজন হ্রাস।

● ঘাম বৃদ্ধি, তাপের অসহিষ্ণুতা এবং বারবার মলত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি।

● অনিয়মিত মাসিক চক্র এবং মহিলাদের মধ্যে মাসিক রক্ত প্রবাহ কমে যায়।

● হাইপারথাইরয়েডিজমের ফলে হাড়ের ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং অস্টিওপোরোসিস হতে পারে।

থাইরয়েড রোগের প্রবণতা :

● থাইরয়েড রোগ পুরুষ, মহিলা, শিশু, কিশোর ও বয়স্ক যে কোনো ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে মহিলারা পুরুষদের তুলনায় এই রোগে বেশি আক্রান্ত হন।

থাইরয়েড রোগ হওয়ার কারণ :

● থাইরয়েড রোগের পারিবারিক ইতিহাস আছে এমন ব্যক্তিদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

● যেসব ব্যক্তি রক্তাল্পতা, টাইপ-১-ডায়াবেটিস, প্রাথমিক রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইত্যাদিতে ভোগেন তাদের এই রোগ হতে পারে।

● বেশি আয়োডিন আছে এমন ওষুধ সেবনেও হতে পারে।

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত সেক্ষেত্রে :

● গলার ভয়েস বক্সের দুইদিকে ফোলা অনুভব করলে।

● হতাশা, নার্ভাস, ডিপ্রেশন বা মেজাজ পরিবর্তন হলে।

● অনেকক্ষণ ধরে গরম অথবা শীত অনুভূত হলো।

● খুব বেশি শ্রান্তি বা ক্লান্তি অনুভব করলে।

● হঠাৎ ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধি হলে।

প্রতিরোধের উপায় :

প্রক্রিয়াজাত খাবারের অনেক রাসায়নিক, থাইরয়েড হরমোন তৈরিকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এ ধরনের খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। থাইরয়েড থাকলে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলি ও পালং শাক একেবারেই এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ এই শাকসবজিতে গয়ট্রোজেন থাকে যা থাইরয়েড গ্রন্থির আয়োডিন শোষণে বাধা দেয় এবং হাইপারথাইরয়েডিজমকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সয়াবিন খাওয়া সীমিত করতে হবে, কারণ এটি থাইরয়েড হরমোন তৈরিকে প্রভাবিত করে। ধুমপান বন্ধ করতে হবে, কারণ ধূমপানের সময় নির্গত টক্সিন থাইরয়েড গ্রন্থিকে বেশি সংবেদনশীল করে তুলতে পারে যা থাইরয়েড রোগের কারণ হতে পারে। অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে থাইরয়েড হতে পারে। বয়স অনুযায়ী নিয়মিত কাজ কর্মের মধ্যে থেকে শরীরকে সক্রিয় রাখলে এবং ধ্যান, আসন, প্রাণায়াম ও যোগ ব্যায়াম করলে মানসিক চাপ কম থাকে। মনে রাখতে হবে, মানসিক চাপ কমাতে পর্যাপ্ত ঘুমেরও প্রয়োজন আছে। □

মল্লারপুরে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠান

পূর্বাঞ্চল কল্যাণের আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৫ ডিসেম্বর (বাংলা ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩১) বীরভূম জেলার পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে ৬১ জোড়া বনবাসী দম্পতির 'সামূহিক বিবাহ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলকাতা-নিবাসী কার্যকর্তা বিবেক চিরানিয়া, কমল পুগলিয়া ও উমা সুরানার আর্থিক সহযোগিতায় এই সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৬০ নং জাতীয় সড়কের পাশে মল্লারপুর ছাত্রাবাসের পুরো প্রাঙ্গণজুড়ে বিশালাকার প্যান্ডেল, মঞ্চ, ছাদনাতলা, রন্ধনশালা, প্রবেশপথে তোরণ এবং একটু দূরে অস্থায়ী শৌচালয় নির্মিত হয়। পানীয় জলের সরবরাহ-সহ সাইকেল, বাইক ও গাড়ি পার্কিঙের সুব্যবস্থা ছিল। বিবাহ অনুষ্ঠানের আগেরদিন বিকালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ২৫ জোড়া, বীরভূম জেলার ৩৬ জোড়া দম্পতি, তাঁদের সন্তানসন্ততি এবং উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গ্রামবাসী, মাঝিহারাম-সহ প্রায় ১২০০ জন উপস্থিত হন।

সন্ধ্যায় সুসজ্জিত ছাদনাতলায় শাল-মহুয়া-কলাগাছ রোপণ অর্থাৎ, 'মাণ্ডোয়া'-র মাধ্যমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তারপর 'সুনুম-সাসাং অজঃ', অর্থাৎ, গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে সকলে মেতে ওঠে। গভীর রাত পর্যন্ত সাঁওতালি গানে সকলে হয় মাতোয়ারা। রাত্রি অবসানে প্রভাত সূর্যের আনন্দ কিরণে আশ্রম সংলগ্ন জলাশয়ের পাড়ে 'দাঃ বাঁপলা', অর্থাৎ, শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। চারিদিক থেকে বেজে ওঠে জনজাতি বাদ্যযন্ত্র। এরপর 'কাপিদাঃ জর', অর্থাৎ পুণ্যস্নান। সকাল ৮টা থেকে সকলের জন্য ছিল স্বল্পাহার— মুড়ি, ঘুগনি ও চায়ের ব্যবস্থা। তীব্র শীতে রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় অগ্রহায়ণের বিবাহবাসরে যেন ঘটে বসন্তের সমাগম। বাজে সানাইয়ের সুর। ধামসা-মাদলের তালে তালে বাহারি পোশাকে সুসজ্জিত বনবাসী নৃত্যশিল্পীদের আকর্ষণীয় ছন্দবদ্ধ নৃত্য এবং চন্দনের ফোঁটা-সহ প্রবেশদ্বার থেকে আপ্যায়িত করা হয় আমন্ত্রিত সকল অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের। কলকাতা থেকে আগত প্রায় ১৫২ জন অতিথি-অভ্যাগত, কার্যকর্তা ও বিভিন্ন পরিবারগুলিকে স্বাগত জানানো হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই আনন্দনৃত্যে যোগ দেন। মূলমঞ্চের সামনে ৬১ জোড়া বর-বধূ শুভ্রবসনে, মাথায় টোপর পরে উপস্থিত হন এবং সারিবদ্ধভাবে বসে থাকেন পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য। সকালে শ্রদ্ধেয় কেদারবাবা সাঁওতালি গানে অনুষ্ঠানমঞ্চ মাতিয়ে দেন।

সামূহিক বিবাহের মূলপর্বের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুনীল মস্করা ও মধুমিতা মস্করা, প্রধান বক্তা, শিক্ষক শুকদেব টুডু, বিশিষ্ট অতিথি মঞ্জু খৈতান, খেমচাঁদ বোথরা, কিষাণ জালান, নেপাল মুর্মু ও পূর্বাঞ্চল কল্যাণ

আশ্রম দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক সভাপতি ডাঃ চুনারাম মুর্মু।

প্রদীপ প্রজ্বলনের পর হয় অতিথিদের পরিচয়পর্ব। এরপর হয় অতিথিদের বরণ এবং ছাত্রাবাসের একজন ছাত্রের এককগীত। অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে হয় দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। উভয়পক্ষের (বর-বধূ) মাঝিহারামদের সাক্ষী রেখে সমাজসেবী ও জগমঁজহী পাউল হাঁসদা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও নাইকে নেপাল মুর্মুর পৌরোহিত্যে 'সিন্দরো দান', অর্থাৎ, সিঁদুরদান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় 'সুগন বাপলা' অর্থাৎ শুভবিবাহ। অনুষ্ঠানস্থলে তখন উপচে পড়া ভিড়। মায়েদের উলুধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত। বর-বধূকে পোশাক, রূপচর্চার প্রসাধন দ্রব্য, মাদুর, মশারি, বিছানার চাদর, রান্নার বাসনপত্র, ছাতা এবং একটি টিনের বড়ো বাক্স যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়। দুপুরের প্রীতিভোজের আয়োজনে ছিল ভাত, ডাল, দু'রকম সবজি, টক ও মিষ্টি। প্রায় ৬ হাজার জন এই প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করেন। বিবাহ অনুষ্ঠান হতে যৌতুক ও শংসাপত্র, সিঁথিতে সিঁদুর, কোলে শিশু সন্তান, মুখে একরাশ হাসি নিয়ে বাড়ি ফেরা। আমন্ত্রিত সকলেই বাড়ি ফিরলেন বুক ভরা আনন্দ নিয়ে যা অবর্ণনীয়।

সিউড়ি অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

গত ২৯ ডিসেম্বর বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ির বেণীমাধব ইনস্টিটিউশনের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশু মন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। শঙ্খধ্বনি, তোপধ্বনির পর মশাল দৌড় শুরু হয়। তারপরেই প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পুলক কুমার সিনহা। পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান অতিথি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহাদেব চন্দ্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি লক্ষ্মণ বিষুও, সম্পাদক পরিতোষ হাজরা, জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দে, প্রাক্তন প্রধানাচার্য মানব রায়, শিক্ষক-সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য, সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ভাই-বোনেরা মাঠ পরিক্রমা ও ব্যায়ামযোগ করার পর মোট ৩৯টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শিশুদের অভিভাবকদেরও বিশেষ প্রতিযোগিতার পর অরুণ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর ভাই-বোনদের যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রধানাচার্য নির্মল ঠাকুর। পতাকা অবতরণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে কলকাতা কৃষ্ণপুর পালপাড়ায় গীতাজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ২২ ডিসেম্বর সংস্কৃতভারতী পূর্ব কলকাতা জেলার উদ্যোগে কৃষ্ণপুর পালপাড়ায় গীতাজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে শতাধিক গীতাপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিপিন প্রসাদ আগরওয়ালা। গীতার প্রথম অধ্যায় সমবেত পাঠ হয়। গীতা গ্রন্থের বিশদ আলোচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তন্ময় কুমার ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন স্থানীয় কার্যকর্তা কপিল শর্মা।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের শীতকালীন শিবির

গত ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর কলকাতার মানিকতলা কল্যাণ ভবনে ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজের উদ্যোগে শীতকালীন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি ডাঃ সুকুমার মণ্ডল ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ দিলীপ দে-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪০ জন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে চিকিৎসাক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, চর্চা ও মত বিনিময় করা হয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি ভাষণে কার্যকরী সভাপতি ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু সকলকে পবিত্র মন নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের মঙ্গলার্থে এই মহান সেবাকাজে ব্রতী হতে আহ্বান জানান।

জলপাইগুড়িতে লোকপ্রজ্ঞার উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৈঠক

গত ২৯ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ির অরবিন্দ নগরস্থিত সারদা শিশুতীর্থে অনুষ্ঠিত হলো লোকপ্রজ্ঞার উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৈঠক। উত্তরবঙ্গের মালদা, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের ৭টি চর্চাকেন্দ্র থেকে ৯ জন মহিলা-সহ মোট ২৮ জন প্রতিনিধি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ, শিশুতীর্থের প্রধানাচার্য নাড়ুগোপাল দে, জলপাইগুড়ি চর্চা কেন্দ্রের ব্যাস প্রমুখ শম্ভুনাথ মিস্ত্রী প্রমুখ। বৈঠকের শুরুতে সংগঠন মন্ত্র পাঠ করেন জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের মাতৃশক্তি প্রমুখ কাকলি মণ্ডল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কিশোর কুমার রায়। লোকপ্রজ্ঞা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ড. সুমন পাণিগ্রাহী। উত্তরবঙ্গের প্রতিবেদন পাঠ করেন কোচবিহার চর্চাকেন্দ্রের সংযোজক অভিজিৎ গলুই। সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়। আগামী কিছু কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে আগত শিল্পী দশম শ্রেণীর রৌণক জমাদার তিন ঘণ্টার মধ্যে একটি সরস্বতী প্রতিমা নির্মাণ করে এবং অনীক শর্মা বংশীবাদন করে। মতুয়া সম্প্রদায়ের কয়েকজন গোঁসাই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। দীপঙ্কর বালা ও স্বপন বিশ্বাস শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর ও শান্তিমাতার পূজা পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। ভোজন পরবর্তী অধিবেশনে 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটির সংস্কৃত অনুবাদিত রূপ পরিবেশন করে নবম শ্রেণীর ছাত্রী অনুপ্রভা মিস্ত্রী। প্রান্তের কার্যকর্তাসূচি ঘোষণা করেন অরবিন্দ দাশ। বন্দেমাতরম গানের মাধ্যমে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বৈঠক সঞ্চালন করেন উত্তরবঙ্গ সংযোজক সুমন পাণিগ্রাহী।

সনাতন হিন্দুধর্ম সংগঠনের উদ্যোগে দত্তপুকুরে হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ

গত ২৯ ডিসেম্বর দত্তপুকুর সনাতন হিন্দুধর্ম সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় দত্তপুকুর স্টেশন সংলগ্ন নিবাধুই স্কুল খেলার মাঠে আয়োজিত হলো হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ। দুপুর ১টায় তুলসী পূজন ও গীতাপূজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহামণ্ডলেশ্বর পূজ্যপাদ পরমাত্মানন্দ মহারাজ, ইসকনের শ্যামকৃতি দাস অধিকারী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নিরঞ্জন মহারাজ, মতুয়া সঙ্ঘের মহিতোষ বৈদ্য ও পরিতোষ দাস, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী চন্দ্রিমা, শ্রীগুরু সঙ্ঘের সুনীল পাল, গৌড়ীয় মঠের বাবলা দাস, শ্রীশ্রী রামঠাকুরের সংগঠনের ড. পুলিনরঞ্জন দাস, সুখেন্দু কুমার ও সুনীল মণ্ডল, আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী-সহ প্রমুখ সাধু সন্ত তথা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। উপস্থিত সন্তগণ গীতাপাঠের আবশ্যকতার পাশাপাশি বাংলাদেশ তথা ভারতের হিন্দুদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণ করেন কৌশিক পাহাড়ী, উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সরোজ সাহা, বংশীবাদন করেন কাবেরী সরকার। একক নৃত্য পরিবেশন করেন মৌমিতা মণ্ডল।

সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন দত্তপুকুর নামহট্ট সংস্থার নৃত্যশিল্পীরা। গীতার্চনা শিশু শিক্ষার্থীরা গীতাপাঠ করে।

সমবেতভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম, তৃতীয় ও ষোড়শ অধ্যায় পাঠ করা হয়। ৫০০০-এর বেশি সংখ্যায় সমবেত কণ্ঠে গীতা পাঠ ও মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনিতে সমগ্র দত্তপুকুর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দীপক সমাদ্দার। মঞ্চ সঞ্চালন করেন আহ্বায়ক প্রাণকৃষ্ণ নন্দী। ইসকনের ব্যবস্থাপায় উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

গঙ্গাসাগরে অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ২৯ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয় মাধব ভবনে অনুষ্ঠিত হলো অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ। বর্গে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী দীনেশ কুলকার্ণী, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য কল্যাণ কুমার মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী অনিল রায়, সাধারণ সম্পাদক আশিস সরকার, সম্পাদক কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস, প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ অষ্টগোপাল পাল এবং প্রান্তের প্রচার প্রমুখ ও ভারতীয় কিষাণ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক মিলন খামারিয়া-সহ প্রান্ত ও জেলার অন্যান্য কার্যকর্তারা।

প্রথমদিন সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করার পর ভগবান বলরাম ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে বর্গের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। কৃষি, উৎপাদন, ন্যায্যমূল্য-সহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্গের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও প্রান্তের কার্যালয় সচিব প্রসেনজিৎ নাথ।

ফরাক্কায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে তুলসীপূজন উপলক্ষ্যে সমরসতা সম্মেলন

গত ২৫ ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সামাজিক সমরসতা অভিযানের বার্ষিক উৎসব তুলসীপূজন দিবস উপলক্ষ্যে রঘুনাথগঞ্জ জেলার ফরাক্কা প্রখণ্ডে হেলিপ্যাড ময়দানে সমরসতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শুরুতে ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার প্রদীপ প্রজ্বলন করেন এবং তার পরেই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বাদল মহারাজ তুলসী পূজন করেন। মঙ্গলাচরণ ও সমবেত সংগীতের পর প্রখণ্ড সম্পাদক কাজল মণ্ডল কাজের বিবরণ দান করেন। পরিষদের মধ্যবঙ্গের প্রবীণ কার্যকর্তা কুশল কুণ্ডুর বক্তব্যের পর প্রধান বক্তা গৌতম সরকার তুলসীমাতার মাহাত্ম্য, আঁটপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের সন্ন্যাস গ্রহণ, কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর ভারতসাধনা, গুরু গোবিন্দ সিংহের সম্পূর্ণ পরিবারের বলিদান, আর্য সমাজের শুদ্ধি আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ স্বামী

শ্রদ্ধানন্দজীর বলিদানের কথা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন। মধ্যবঙ্গের সহ সম্পাদক অসীম রায় এবং জেলার অন্যান্য কার্যকর্তারা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা প্রচারক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আলোচনা সভা

গত ২৯ ডিসেম্বর বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান সভাকক্ষে আয়োজিত হয় 'বাংলা ভাষা, বাঙ্গালিত্ব ও সময়'-শীর্ষক একটি আলোচনা সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস কুমার গিরি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক অনির্বাণ দে এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ সুদীপ্ত গুহ। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিশিষ্ট জনদের বক্তব্যে উঠে আসে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ এবং তা মোকাবিলা করার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বক্তারা।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্যাতন সমাজে ও সমাজমাধ্যমে মুখ্য আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলেও পাকিস্তান গঠনের সময় থেকে হিন্দু নির্যাতন হয়েই চলেছে বলে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক প্রবীর ভট্টাচার্য তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বিভিন্ন উদাহরণ-সহ তা তুলে ধরেন। সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল জিন্না ও মুসলিম লিগের মূল লক্ষ্য। কিন্তু তাতে বাদ সেধেছিলেন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মুসলিম লিগের প্ররোচনায় বঙ্গের বিভিন্ন অংশে মুসলমানরা তাদের পেশি শক্তির প্রদর্শন করতে প্রচুর দাঙ্গা হাঙ্গামা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যার মতো পাশবিক ঘটনা ঘটালেও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টিকে আটকে রাখা যায়নি। দেশভাগের পর কলকাতাকে না পাওয়ার বেদনা পাকিস্তানপন্থী মুসলমানদের কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে বাঙ্গালি জাতিসত্তার অস্তিত্ব কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয় চল্লিশের দশক থেকেই। সত্তরের দশকে পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলেও হিন্দুশূন্য দেশ গড়া এবং বাঙ্গালি জাতিসত্তা লোপ করার কাজে তাদের মনোভাব অটুট থাকে।

বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি তথা পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. আশিস কুমার গিরি বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ায় এই ভাষার প্রাচীনত্বের ইতিহাস চর্চার সুযোগ আরও বেড়ে গেল বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। সংস্কৃত ছাড়া দেশের অন্য পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষা ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ায় বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ বাংলাভাষার ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়ার জন্য যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা সবিস্তারে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি আনন্দের বিষয় যে ভারত সরকার সম্প্রতি বাংলাভাষাকে এই স্বীকৃতিদান করেছে। তিনি বলেন, বাঙ্গালির শাস্ত্রীয় নৃত্য (গৌড়ীয় নৃত্য) সরকারি স্তরে আজও অবহেলিত, বাঙ্গালির সংগীত কীর্তন ও উপাসনা বাদ্য শ্রীখোল ও ঢাক ঢোল। দক্ষিণ ভারতের ঘটুম ধ্রুপদী বাদ্যযন্ত্রের মর্যাদা পেলেও যে মাপকাঠিতে ধ্রুপদী মর্যাদা পাওয়া যায় শ্রীখোলের ক্ষেত্রে তা যথাযথ হলেও এখনও সেই স্বীকৃতি প্রাপ্তি অধরা রয়ে গিয়েছে শ্রী গিরি উল্লেখ করেন। কেবলমাত্র সরকারি উদাসীনতায় বাঙ্গালির সাংগীতিক পরিচয় আজ অবহেলিত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতিকে কীভাবে পরিকল্পিত উপায়ে আরবীয় সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু। বাংলাভাষার বরেণ্য লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রচিত একটি অধ্যায়ের উল্লেখ করে তিনি হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্যশূন্য সামাজিক অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন বাঙ্গালি কারা? পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা হলেও তাদের বাঙ্গালি বলা যায় কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ কীভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ক্রমাগত বাংলাভাষার প্রাকৃত শব্দগুলি পরিবর্তন করে চলেছে তা নিয়ে একটি বিস্তারিত গবেষণাপত্র পড়ে শোনান অনির্বাণ দে। প্রায় পাঁচ দশক ধরে বাংলা বর্ণমালার লিপিগুলিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিতরণ করা একটি পত্রকের মাধ্যমে তা বোঝানোর প্রয়াসও চলে এদিন। টেলিভিশনের বিতর্ক সভার জনপ্রিয় মুখ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সুদীপ্ত গুহ আগামীদিনে বাঙ্গালিকে আবার প্রতিষ্ঠা পেতে হলে নতুন প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে বলে জোরের সঙ্গে জানান। স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম কবিতা, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' অবলম্বনে একটি কবিতা আলেখ্য পরিবেশন করে 'নন্দন কানন'। সমবেত 'বন্দেমাতরম' গানটির মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সভা সঞ্চালনা করেন প্রবীর ভট্টাচার্য।

বর্ধমানে শৈব মহাসঙ্ঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন এবং প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৫ ডিসেম্বর বর্ধমানের নবাবহাট-স্থিত ১০৮ শিবমন্দির প্রাঙ্গণে শৈব মহাসঙ্ঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তার সঙ্গে শৈব মহাসঙ্ঘের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অসম থেকে আগত শৈব মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সৌমিত্র গোস্বামী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ১০৮ শিবমন্দিরের অন্যতম কর্ণধার তথা শিবমন্দিরের জয়েন্ট যুগ্ম সম্পাদক গৌতম দাঁ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের চন্দ্রচূড় শিবমন্দির কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, বার্নপুরের বারী শিবমন্দিরের প্রতিনিধি-সহ ২৩০ জন প্রতিনিধি। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম-সহ প্রায় সাতটি জেলা থেকে এবং ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম ও পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হন। সম্মেলনে শৈব মহাসঙ্ঘের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শৈব মহাসঙ্ঘের রাজ্য কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বাপি প্রধান ও রাজীব চৌধুরীকে নিয়োজিত করা হয়। বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। বর্ধমানের দু'টি বিখ্যাত নাচের দল, যথা তপস্যা নৃত্যালয় ও বৈতালিক ডান্স অ্যাকাডেমি—শৈব দর্শন ও সংস্কৃতির উপর দু'টি সুন্দর নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন। এছাড়া আলাপন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একটি গান পরিবেশিত হয়। এর পাশাপাশি আয়োজিত হয় একটি সাংবাদিক সম্মেলন। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন শৈব মহাসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সৌমিত্র গোস্বামী। তিনি বলেন , শৈব মহাসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির পাঁচটি মূলধারার (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর) মধ্যে শৈব ধারাকে কেন্দ্র করে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। সেই কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত-সহ সমগ্র বিশ্বে শৈব দর্শন ও সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করা হলো মহাসঙ্ঘের মূল লক্ষ্য। শৈব দর্শনের প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতি, তথা ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হলো মহাসঙ্ঘের উদ্দেশ্য। এরপর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শৈব মহাসঙ্ঘের অন্যতম দুই রাজ্য কো-অর্ডিনেটর নরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও বাপি প্রধান সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের বক্তব্যে শৈব মহাসঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভারতবর্ষের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বিষয়ে উল্লেখ করেন। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থলে ভবিষ্যতে একটি করে অতিথি নিবাস গড়ে তোলার পরিকল্পনা এবং স্বল্পমূল্যে সমাজের আপামর মানুষকে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর কথাও তাঁরা বলেন। শৈব দর্শন ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে ভবিষ্যতে কুম্ভমেলার মতো একটি বৃহৎ আকারের রুদ্রমেলার আয়োজনের মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক মেলবন্ধন ঘটিয়ে ভারতের সনাতন ধর্ম ও ঐতিহ্যকে উজ্জীবিত করার কথাও তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সরস্বতী শিশু মন্দিরের উদ্‌ঘাটন

গত ১ জানুয়ারি নদীয়া জেলার তাহেরপুর পুরাতন পাড়ায় কল্পতরু দিবসের পুণ্যলগ্নে 'তাহেরপুর মাধব সরস্বতী শিশু মন্দির'-এর শুভ উদ্‌ঘাটন সম্পন্ন হলো। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ নদীয়া জেলার সঙ্ঘচালক ড. উত্তম ঘোষ, জেলা কার্যবাহ রঞ্জিত সরকার

নদীয়া বিভাগ প্রচার প্রমুখ পার্থিব মুখার্জী-সহ বহু কার্যকর্তা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৩০০ জন পুরুষ-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নতুন বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষে ৫৬ জন শিশু ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়েছে। এদিনই ধানতলা খণ্ডের শ্রীধরপুরে 'শ্রীধরপুর সরস্বতী শিশুমন্দির'-এর শুভ উদ্বোধন হয়। ১৫ জন শিশু এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এখানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রবীর বিশ্বাস, নদীয়া বিভাগ কার্যবাহ অরিন্দম বালা, জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ বরুণ বিশ্বাস, ব্যবস্থা প্রমুখ সমীর পসারি, প্রচার প্রমুখ তরুণ বিশ্বস-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও রাষ্ট্রবাদী মানুষ।

বনগাঁয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে দীক্ষাদান অনুষ্ঠান

খ্রিস্টান মিশনারিরা সম্প্রতি বনগাঁর মিলনপল্লীর হরিজন সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারকে খ্রিস্টান করবার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে স্থানীয় যুবকরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী অঙ্গীরানন্দজী মহারাজ এবং স্থানীয় যুবকরা মিলন পল্লীতে একাধিক বার এসে এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ধর্মান্তরণের হাত থেকে রক্ষা করেন। স্থানীয় মানুষ এবং অঙ্গীরানন্দজী মহারাজের যৌথ উদ্যোগের ফলে এলাকার বাসিন্দারা খ্রিস্টান হওয়া থেকে বিরত থাকেন। একাধিক বার তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে মহারাজ তাঁদের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দীক্ষায় দীক্ষিত করেন। দীক্ষা গ্রহণের দিন মহারাজ হরিজন পল্লীর মায়েদেরর হাতে ৫০টি শাড়ি এবং পুরুষদের হাতে ৫০টি ধুতি তুলে দেন। সন্ধ্যাবেলায় অনুষ্ঠিত হয় হোম ও যজ্ঞ। তার মধ্য দিয়ে এই এলাকায় সৃষ্টি হয় একটি সুন্দর পরিবেশ। অনুষ্ঠান শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলে একই পঙ্ক্তিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এলাকার সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সফল করার জন্য স্থানীয় যুবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের এই ত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম হিন্দুসমাজ ও হিন্দুত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান হয়ে থাকবে।

মাহেশ্বরী মহাসভার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

অখিল ভারতবর্ষীয় মাহেশ্বরী মহাসভার অধীনস্থ সংগঠন— পর্যাবরণ চেতনা এবং সংবর্ধন সমিতির উদ্যোগে এবং কলকাতা প্রাদেশিক মাহেশ্বরী সভার সহযোগিতায় আয়োজিত হয় 'বৃহৎ বৃক্ষরোপণ সমারোহ'। হাওড়া জেলা-স্থিত ফাউন্ড্রি পার্কে রোপণ করা হয় ২০০টি চারাগাছ। শকুন্তলা দেবী বঙ্কটলাল গগ্গড় চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নন্দকিশোর লখোটিয়া। ধরিত্রীমাতার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণের কার্যকারিতা এবং এই বিষয়ে সমাজের দায়িত্বের বিষয়টি তিনি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন এবং এই কর্মসূচি আয়োজনের জন্য পর্যাবরণ চেতনা সমিতির সদস্য প্রবীণ গগ্গড়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সফলভাবে এই কার্যক্রম আয়োজনের জন্য সহ-প্রদেশ সভাপতি দিলীপ লাহোটীর অক্লান্ত প্রয়াসের উল্লেখের পাশাপাশি এই কার্যক্রম আরও বেশি করে আয়োজনের বিষয়ে প্রদেশ সমিতির আঞ্চলিক স্তরের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেন। বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে ফাউন্ড্রি পার্কে স্থান সঙ্কুলানের জন্য সতীশ তাপড়িয়ার উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রদেশ সভাপতি বিনোদ জাজু। এই ধরনের কার্যক্রম আয়োজনের বিষয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে তিনি উৎসাহিত করেন। মাহেশ্বরী সমাজের সদস্যরা এই কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কার্যক্রমে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন প্রদেশ সম্পাদক সম্পত মান্ধনা, মাহেশ্বরী মহাসভার কার্যসমিতির সদস্য শ্যামসুন্দর রাঠী, পূর্বতন প্রদেশ সভাপতি ভঁওয়ার লাল রাঠী, সদস্য শ্যামসুন্দর বাগড়ী, রাজেশ নাগোরী, অশোক ভট্টড়, রমেশ চাণ্ডক, সুরজ বাগড়ী, অরুণ মল্লাবত, অনিল লখোটিয়া, ভগবতী প্রসাদ মুন্ধড়া, বিকাশ লাহোটী, নরেন্দ্র মান্ধনা, হরীশ দম্মাণী, গৌতম তাপড়িয়া, মাহেশ্বরী জাগৃতি ক্লাব, হাওড়ার সভানেত্রী সংগীতা লখোটিয়া, সীমা ভট্টড়, অনীতা লখোটিয়া ও অন্যান্যরা। কার্যক্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের হাতে বৃক্ষরোপণ করেন। বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে মাহেশ্বরী সমাজের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করে আগামীদিনে জোকাতে ২০০টি চারাগাছ রোপণের একটি কর্মসূচির বিষয়ে ঘোষণা করেন দিলীপ লাহোটী।

প্রয়াগের মহাকুম্ভে নাগা সাধুর সন্ধানে

দুর্গাপদ ঘোষ

গত ডিসেম্বর মাসের ১৩ ও ১৪ তারিখে প্রয়াগরাজে যেন উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। আনন্দ ও উৎসাহের বন্যা বইতে থাকে। ত্রিবেণী সঙ্গমে আয়োজিত মহাকুম্ভ মেলার যোগ দেবার জন্য প্রথম দিন প্রয়াগরাজের ক্যান্টনমেন্ট পরিসরে আগমন ঘটে বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় আখড়ার প্রমুখ সন্ন্যাসীদের। তা নিয়ে সর্বত্র হইচই পড়ে যায়। দ্বিতীয় দিনটি ছিল আরও বর্ণময়। সেদিন ওই সেনা ছাউনি থেকে বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে সঙ্গম প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হন কুম্ভমেলার প্রাণপুরুষ জুনা আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীরা। পুণ্যস্নানে সর্বপাপ নাশান্তে মোক্ষলাভের আকুতি ছাড়াও বিশ্বের এই বৃহত্তম মহামিলন মেলার সবচাইতে বড়ো আকর্ষণ যে নাগা সাধুরা একথা সর্ববিদিত। এ বছর সেই সাধুদের প্রথম দলের কুম্ভে পদার্পণ তাই ছিল চোখে পড়ার মতো। যে আগমনকে প্রথাগতভাবে 'পেশওয়াই' বা 'ছাউনি প্রবেশ' বলা হয়ে থাকে। ছাউনি শব্দটি সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেই সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে। নাগাসাধুরাও বস্তুত একটা সেনাবাহিনী। তাই তাঁদের অস্থায়ী আখড়াকে তাঁরা ছাউনি বলে থাকেন।

প্রয়াগরাজের সেনা ছাউনি থেকে মেলা প্রাঙ্গণের ১৮ নম্বর সেক্টরে বানানো নাগা-ছাউনি ৩ কিলোমিটার পথ। আখড়ার ধর্মধ্বজ উঁচিয়ে কাইদগঞ্জের মৌজগিরি আশ্রম থেকে জুনা আখড়ার প্রধান আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর অবধেশানন্দ গিরিকে সামনে রেখে শোভাযাত্রা শুরু হতেই ভক্ত ও সাধারণ মানুষের বেশিরভাগই রাস্তায় নেমে আসেন। সুসজ্জিত ঘোড়া, রত্নখচিত সিংহাসন এবং ডোলি বা পালকির মতো বাহনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি এবং আরও ৫০ জনের মতো মহামণ্ডলেশ্বর মেলাপ্রাঙ্গণে আসার সময় রাস্তার দুধারে, ঘরবাড়ির বারান্দা ও ছাদ থেকে নিরন্তর পুষ্পবর্ষণ করে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শোভাযাত্রায় এসে যোগ দেয় মহিলা নাগা সন্ন্যাসিনীদের 'কিন্নর আখড়া'। যমুনাপাড়ের মৌনীগিরি আশ্রম থেকে বেরিয়ে 'দেবত্ব যাত্রা' করে তাঁরাও প্রবেশ করেন সঙ্গম প্রাঙ্গণে তাঁদের জন্য নির্ধারিত ছাউনি বা আখড়ায়। প্রতি ৬ বছর অন্তর অর্ধকুম্ভ, প্রতি ১২ বছর অন্তর পূর্ণকুম্ভ কিংবা প্রতি ১৪৪ বছর অন্তর মহাকুম্ভ, যাই হোক না কেন, পুণ্যার্থী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ পর্যটক, সকলের কাছেই কুম্ভমেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। কেবলমাত্র নানা ধরনের অঙ্গসজ্জা, বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ জটাজুট, রাশি রাশি সাধুদের একবার স্বচক্ষে দেখার জন্যও দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ কুম্ভমেলায় আসেন। বিশেষ করে নাগা সন্ন্যাসীদের দেখতে আগ্রহের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। ১৪৪ বছর পরে এবছরের মহাকুম্ভে সব মিলিয়ে ৪০ কোটিরও বেশি ভক্ত, পুণ্যার্থী ও অন্যদের আগমন হতে পারে মনে করা হচ্ছে। জুনা আখড়া-সহ নাগাদের মোট ১৩টি আখড়ার

নাগা সন্নাসীদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ তাই অতি স্বাভাবিক।

এর আগে ১৯৯৫ সালে স্বস্তিকার সাংবাদিক হিসেবে প্রয়াগের অর্ধকুম্ভ মেলা কভার করতে এসে এক নাগা সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দেড়-দু' ডিগ্রি ঠাণ্ডায় এত ভোরে খালি গায়ে রয়েছেন, জলে ডুব দিচ্ছেন, শীত লাগছে না? উত্তরে ঠাণ্ডার অনুভূতিহীন কিংবা শিরশিরানির কোনো চিহ্ন না থাকা মানুষটি জবাচক্ষু মেলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবলোকন করে মেঘমন্দ্র স্বরে জবাব দিয়েছিলেন, ঠাণ্ডা-গরম এসব তো স্রেফ বাহ্যিক অনুভূতির ব্যাপার। মনে করলে ঠাণ্ডা, মনে করলে গরম। না মনে করলে নেই। আপাদমস্তক শীতের পোশাকে মুড়েও প্রায় ঠক-ঠক করতে থাকা কলকাতার সাংবাদিক বাবু মনে মনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাবছিলাম, বলে কী লোকটা! মুহূর্তে চমক ভাঙল তাঁর পরের কথায়, 'উনকো দেখো, উনকো দেখো। হিমালয় কা গহিন বরফ মেঁ ভি ও নাঙ্গা ঘুমতে হ্যায়।' তিনিই তো আমাদের প্রেরণা, পথপ্রদর্শক। ভারতের উত্তরে হিমাদ্রি-হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে আত্মগত স্বরে ফের জানালেন তিনিই তাঁদের ইষ্টদেবতা। কথা বাড়িয়ে হাঁটু অবধি লম্বা, থসথসে ভিজে চুলের ঝুটি বাঁধতে বাঁধতে হন হন করে চলে গেলেন নিজের আখড়ার দিকে। বুঝলাম কৈলাশেশ্বর দেবাদিদেব শিবঠাকুরের কথা বলে গেলেন। যিনি বরফাচ্ছাদিত কৈলাশে থাকেন তাঁকে কখনো চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, হবেও না জানি। কিন্তু এইসব চলমান শিব দেখে বিশেষ কৌতূহল জেগেছিল। সেই থেকে এঁদের সম্পর্কে যথাসম্ভব জানার আগ্রহ জমে ছিল। কুম্ভমেলায় এঁদের আগমন ঘটে ঠিকই কিন্তু বাকি সময় কোথায় থাকেন, কী খান, সকলের হাতে এমন অস্ত্রশস্ত্র কেন, শুধু কি নিজেদের ইষ্টদেবতার সাধনাতে মগ্ন থাকেন নাকি সমাজের জন্যও কিছু করেন ইত্যাদি প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। আরও বড়ো যে প্রশ্ন ছিল, তাহলো, জুনা আখড়ার লক্ষ লক্ষ নাগা সাধুদের এই ভাবে সংগঠিত করার প্রধান প্রেরণাদাতা ও পথপ্রদর্শক কে?

সত্যযুগে দেব-দানবের সম্মিলিত সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অমরত্বের সুধাভাণ্ড থেকে পৃথ্বীভূমিতে পতিত হওয়া কিঞ্চিন্মাত্র অমৃতের স্পর্শ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যে ৪টি স্থানকে উত্তমরূপে পুণ্যস্থানের মর্যাদা দিয়েছে, অমৃততীর্থে পরিণত করেছে, তার মধ্যে তীর্থরাজ হলো প্রয়াগ। বাকি ৩টি স্থান হলো উত্তরাখণ্ডে হরিদ্বার, মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী এবং মহারাষ্ট্রের নাসিক। প্রতি ১২টি পূর্ণকুম্ভের সম্মিলিত মহাকুম্ভ যোগ পড়ে ১৪৪ বছর অন্তর। আর সেই মহাকুম্ভমেলা হয় কেবল প্রয়াগে। প্রয়াগ তাই প্রয়াগরাজ। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সেই মহাকুম্ভমেলার প্রধান তিন স্নান থাকে 'রাজসী' বা শাহী স্নান বলা হয়ে থাকে। সেই বিশেষ দিনগুলি হলো মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমবাস্যা এবং বসন্ত পঞ্চমী তিথি। আনুষ্ঠানিকভাবে এবারের মহাকুম্ভ মেলার সময়কাল মোট ৪৫ দিনের। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কিন্তু অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে কল্পবাস। আগমন ঘটেছে সাধুসন্ত থেকে শুরু করে সাধারণ ভক্ত তথা পুণ্যার্থীদের। বিশেষ করে জুনা আখড়ার বিপুল সংখ্যক সন্ন্যাসীর আগমন। কুম্ভমেলা মানেই যেন নাগাসাধু সমাবেশ। যার জন্য সকলেই প্রতিক্ষা করে থাকেন। সেই প্রতিক্ষার অবসান ঘটেছে গত ১৩-১৪ ডিসেম্বর থেকে। তার আগে গত ২৬ নভেম্বর মেলা প্রাঙ্গণের সেক্টর ১৮-তে জুনা আখড়ার জন্য 'আচার্য শিবির'-এর ভূমি পূজন করেন পীঠাধীশ্বর স্বামী অবধেশানন্দজী।

প্রসঙ্গত, সাধারণভাবে 'আখড়া' শব্দের অর্থ হলো ডেরা অথবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সে প্রশিক্ষণ নানা ধরনের হতে পারে। ধর্মীয় প্রবচন, নীতিকথা, রামায়ণ কথা, গীতাজ্ঞান, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ছাড়াও নানা ধরনের খেলাধুলা, কুস্তি, লাঠি-সড়কি চালনা, এমনকী আরও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তথা যুদ্ধের প্রশিক্ষণও হতে পারে। যেমন বর্তমান উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুন এক সময় ছিল কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের কেন্দ্র। ডেরা দ্রোণ থেকে অপভ্রংশে হয়েছে দেরাদুন। সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে ডেরাকে সাধারণভাবে আখড়া বলা হয়ে থাকে।

এবারের মহাকুম্ভে দশনামি জুনা আখড়ার ৫ হাজারেরও বেশি নতুন নাগাসাধুর আগমন ঘটেছে। সেইসঙ্গে পুরাতন সাধুরা তো আছেনই। সনাতনী হিন্দুদের জুনা আখড়া সব আখড়ার মধ্যে কেবল বৃহত্তমই নয়, এতে সাড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি নাগা সন্ন্যাসী আছেন। নাগা সাধুদের ইতিহাসই তাঁদের বৈশিষ্ট্য সে ইতিহাস যেমন সাধন-ভজনের, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের, তেমনি শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব এবং সংগ্রামেরও। অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ (এবিএপি)-র অধ্যক্ষ শ্রীমন্ত রবীন্দ্র পুরী জানিয়েছেন, 'জুনা আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীরা শুধুমাত্র ইষ্ট সাধনায় মগ্ন বা আত্মজ থাকেন না। দরকার পড়লে সনাতন ধর্মরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরকম ঘটেছেও বহুবার।' নাগা সাধুরা সাধারণত লোকচক্ষু তথা জনকোলাহলের বাইরে থাকতে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। কারণ তাঁদের জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর না হওয়া মানবদেহের অভ্যন্তরে যেমন রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়ে থাকে, দেহকে শক্তি জোগায়, সনাতন হিন্দু সমাজদেহে নাগারা অনেকটা তেমনি। মানবদেহে কোথাও কখনো কোনো আঘাত পড়লে, ক্ষত সৃষ্টি হলে, যেমন রক্ত বেরিয়ে আসে তেমনি সনাতন ধর্মের ওপর বড়ো ধরনের কোনো আঘাত পড়লে, হিন্দুত্ব ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলে নাগা সাধুরা তাঁদের আখড়া থেকে বেরিয়ে এসে রীতিমতো সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সনাতনকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। ইতিহাস বলছে, ভারতে বহিরাক্রমণকারী আহম্মদ শাহ আবদালি মথুরা বৃন্দাবনে ঢুকে হিন্দু, বিশেষ করে নিরীহ বৈষ্ণব এবং গোমাতাদের নির্বিচারে হত্যা করে যখন গোকুলের দিকে এগোচ্ছিল তখন বর্তমানে উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত্রসজ্জিত নাগা সাধুরা তার গতিরোধ করেছিলেন। তার পরে মারাঠা ভোঁসলেরা ছুটে এসে

আবদালিকে ভারতছাড়া করেন। জুনাগড়ের ক্রুর শাসক নিজামের বিরুদ্ধেও ঘোরতর সংগ্রাম চালিয়ে নাগা সাধুরা তাকে পরাস্ত করেছিলেন। বহিরাক্রমণকারী মুঘলদের বিরুদ্ধেও একাধিকবার এবং একাধিক জায়গায় সশস্ত্র লড়াই করেছেন জুনা আখড়ার 'সনাতনী সেনা'রা।

পঞ্চ দশনামি নাগা সাধুদের প্রত্যেক আখড়া বা ডেরাতেই প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এমনকী গুলি-বন্দুক পর্যন্ত মজুত থাকে। প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে ইষ্টদেবের সামনে শস্ত্রপূজা করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ চলে নিয়মিত। উল্লেখ্য, জগদ্গুরু আদি শঙ্করাচার্য দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চী কামকোটি, পূর্বে পুরীধাম, পশ্চিমে দ্বারকা এবং উত্তরে জোশীমঠ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও সনাতন হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের নিয়ে তৈরি করেন একটি সশস্ত্র বাহিনী। তাঁরা আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন সর্বত্যাগী। এমনকী পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন বলে তাঁদের বলা হয়ে থাকে 'নাগা' অর্থাৎ নাঙ্গা বা বিবস্ত্র। তার মানে এই নয় যে নাগা সম্প্রদায়ের সকলেই দিগম্বর। অনেকে কৌপীন বা ল্যাঙট পরে থাকেন, অনেকে পরেন গৈরিক বসন। বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় এবং আখড়ার পরিচালকরা বর্ণাঢ্য গৈরিক পোশাক পরিধান করে থাকেন। মুখ্যত শিবসাধক নাগা সন্ন্যাসীদের প্রথম আখড়া তৈরি হয় অষ্টম শতাব্দীতে। তখন নাম ছিল 'ভৈরব আখড়া', পরে তা জুনা আখড়া নামে পরিচিতি লাভ করে। পঞ্চ দশনামি জুনা আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে, বর্তমান উত্তরাখণ্ডের কর্ণপ্রয়াগে। পরবর্তীকালে সেখান থেকে আরও অনেক জায়গায় বিস্তৃত হয়। এখন দীক্ষিত নাগা সন্ন্যাসীদের সংখ্যা ৫.৫ লক্ষেরও বেশি এবং এঁদের প্রতেককে 'সেনা' বলা হয়ে থাকে।

কুম্ভমেলায় প্রত্যেকবারই সর্বপ্রথম শাহী স্নান করেন জুনা আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীরা। এবারও যথারীতি তাই। অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ এজন্য অগ্রণী গৈরিক পতাকা বা 'ধর্মধ্বজ' কিছুদিন আগেই জুনা আখড়ার হাতে তুলে দিয়েছে। এই শাহী বা রাজকীয় স্নান সত্যিই যেন রাজকীয়। একটি অতি দর্শনীয় অনুষ্ঠান। প্রধান নাগা সন্ন্যাসীরা সুসজ্জিত ঘোড়া, সোনা-রুপা ও অন্যান্য রত্নখচিত সিংহাসন, হাওদা, ডোলি ইত্যাদিতে আসীন হয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে যান। তাঁদের সঙ্গে এবং পিছনে পিছনে চলেন ত্রিশূল, লাঠি, কুঠার, টাঙ্গি, বল্লম, তলোয়ার ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রধারী হাজার হাজার নাগা সাধু। সবার প্রথমে রাখা হয় লয়ের দেবতা শিব এবং গুরু দত্তাত্রেয়র বিগ্রহ। নাগাদের এই স্নানযাত্রা দেখলে এক নজরে মনে হয় যেন সতীর দেহত্যাগের খবর পেয়ে রুদ্রদেব শিবশম্ভু সৈন্যসামন্ত নিয়ে দক্ষযজ্ঞের উদ্দেশে বেরিয়েছেন। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের পথ ছেড়ে দিচ্ছেন। তাঁদের এই যাত্রাপথে তিলমাত্র বিঘ্ন ঘটলেও যেন মহাপ্রলয় ঘটে থাকে!

জুনা আখড়াকে দশনামি বলা হয়ে থাকে, কারণ সন্ন্যাস লাভের পর প্রত্যেককে ১০টি পদবি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। এটা এই আখড়ার পরম্পরাগত রীতি। সেগুলি হলো গিরি, পর্বত, সাগর, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, বাণ, আচার্য, তীর্থ ও আশ্রম। আখড়ার মুখপাত্র মহন্ত নারায়ণ গিরির কথা অনুযায়ী জুনা আখড়ার সন্ন্যাসীদের মোট ৫২টি পরিবারের সবকিছু দেখভাল করেন ৪ জন 'মধী'। তবে সমস্ত বরিষ্ঠ সদস্যরা মিলেই আখড়াগুলির তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। কিন্তু মুকুট ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার কেবল চার পদাধিকারী— মহন্ত, অষ্টকোশল মহন্ত, কোতওয়াল ও কোঠারীর। বেশিরভাগ নাগা সন্ন্যাসী গিরি ও সরস্বতী পদবি পছন্দ করে থাকেন। মহামণ্ডলেশ্বর আচার্য স্বামী অবধেশানন্দ গিরি বর্তমানে আখড়ার পীঠাধীশ্বর বা প্রধান পদে থাকলেও এবারে মহাকুম্ভের জন্য জুনা আখড়ার নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৪ মধীর অধ্যক্ষ মহন্ত বিদ্যানন্দ সরস্বতী।

কুম্ভমেলায় এলেই চোখে পড়বে অদ্ভুত দর্শন নাগা সাধুদের। যেমন বিচিত্রদর্শন তেমনি বিচিত্র তাঁদের জীবনযাত্রা। কেউ সারাক্ষণ একপায়ে দাঁড়িয়ে আছেন তো কেউ সারাক্ষণ যোগাসনে। কেউ ঊর্ধ্বপদ হয়ে দু'হাতে ভর দিয়ে চলছেন তো কেউ সারাক্ষণ একহাত ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছেন। সেই ভাবেই রুটি সেঁকছেন, খাবার বানাচ্ছেন। কারও মাথায় জটা-রুদ্রাক্ষ মিলে যেন হিমালয়ের কোনো পর্বতশৃঙ্গ তো কারও মাথা থেকে জট পাকানো চুলের দীর্ঘত্ব মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। কেউ শ্মশ্রুগুম্ফহীন তো কারও গুম্ফ আজানুলম্বিত। প্রায় সকলেরই আপাদমস্তক ভস্মমাখা। কপালে তান্ত্রিকের মতো লম্বা-চওড়া সিন্দুরের প্রলেপ। চন্দনেরও। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরমুণ্ডের মতো রুদ্রাক্ষের মালার ভার প্রায় সকলের গলায়। কারও-কারও গলায় তা যেন মহাদেবের গলায় পাকে পাকে জড়ানো সাপের মতো। কারও কারও চোখে মোটা কাজলের প্রলেপ। এরা নাকি সব সময় গঞ্জিকা সেবনে দেবনেত্র হয়ে থাকেন। চাক্ষুস করেই বলছি, অন্য অনেক সাধুকে তা সেবন করতে দেখলেও এই নিবন্ধ লেখকের চোখে কী দিনে কী সন্ধ্যার পর তাঁদের কোনো আখড়ায় কিংবা তার বাইরে নাগা সাধুদের গঞ্জিকা কিংবা অন্য মাদক সেবনের দৃশ্য পড়েনি। অত্যন্ত বিষাদের বিষয় হলো, অনেক উন্নাসিক ব্যক্তি সনাতনী হিন্দুত্বের রক্ষক নাগা সন্ন্যাসীদের 'কিম্ভূত কিমাকার', 'হঠযোগী' ইত্যাদি বলে কটাক্ষ তথা উপহাস করে থাকেন। ঈশ্বর এইসব উন্নাসিকদের প্রতি করুণা করুন, ক্ষমা করুন।

নাগা সাধুদের সঙ্গে থাকা নানা রকমের ধারালো অস্ত্রশস্ত্র কেবলমাত্র বন্য শ্বাপদ কিংবা অন্যদের থেকে আত্মরক্ষার জন্যই নয়, তা মারণাস্ত্রও। প্রয়োজনে পালটা আঘাত করতে একটুকুও দ্বিধা করেন না তাঁরা। নাগা 'সেনা'-দের কাছে এসব হলো বীরত্ব ও ত্যাগের প্রতীক। ঈশ্বর আরাধনার আয়ুধ। শিবের হাতের ত্রিশূল এবং প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করার রণবাদ্য ডমরু, ভৈরবের কুঠার, দেবী দুর্গার শূল, মা কালীর খড়্গ বা তরবারি, ভীমের গদা ইত্যাদি ছাড়াও সুদীর্ঘ চিমটে, কাঁচি এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সবই হলো মন্ত্রপূত। তাঁদের নিজেদের ভাষায় এই সমস্ত শস্ত্র ৪টি শৌর্যের প্রকাশ— সূর্য প্রকাশ, চন্দ্র প্রকাশ,

ভৈরব প্রকাশ ও আনন্দ প্রকাশ। প্রত্যেক আখড়ার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ৪ কোণে ৪ ধরনের অস্ত্র রক্ষিত থাকে। মন্দিরের গর্ভগৃহে বিগ্রহের সামনে ছাড়াও চার কোণের অস্ত্রশস্ত্রেরও পূজা করা হয় প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সময়। কুম্ভমেলায় 'ছাউনি প্রবেশ' এবং প্রত্যেক শাহী স্নানের সময় অস্ত্রসজ্জা বাধ্যতামূলক। মুখ্য তিন পুণ্যস্নানের সময় সবার আগে অস্ত্রকে স্নান করানো হয় পুণ্যতোয়া গঙ্গার জলে। তারপরে সঙ্গমে স্নান করেন আখড়ার আচার্য, মহামণ্ডলেশ্বর, মণ্ডলেশ্বর শ্রীমন্ত। তারপর অন্যান্য নাগা সাধুরা। ঘটনা হলো, শস্ত্রপূজার এই প্রথা-পদ্ধতি শুরু করিয়েছিলেন আদি জগদ্গুরু। সেই থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা চলে আসছে।

জুনা আখড়ার অষ্টকোশল মহন্ত যোগানন্দ গিরি জানালেন যে, গজনির মামুদ যখন সোমনাথ মন্দিরে হামলা চালিয়েছিল তখন সশস্ত্র নাগা সন্ন্যাসীরা তার কুকর্ম রোধ করার জন্য সম্মুখসমরে নেমে অনেকে আত্মবলিদান করেছিলেন। বঙ্গ ও বিহারে ব্রিটিশ শাসকরা যখন ক্রূরনীতি নিয়ে দমন-পীড়ন শুরু করেছিল তখন তার বিরুদ্ধে যে সুবিখ্যাত 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' হয়েছিল তাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন নাগা সন্ন্যাসীরা। যোগানন্দজী আরও জানালেন যে, সেই বিদ্রোহে ৫০ হাজারেরও বেশি সন্ন্যাসী বীরগতি লাভ করেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ সালের সেই সংগ্রামই ছিল প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। নাগা সন্ন্যাস এক ভিন্ন ধরনের সাধনা। কেবল জুনা আখড়াতেই নয় নিরঞ্জনী, শ্রীমহানির্বাণী, আবাহন, আনন্দ এবং অটল আখড়াতেও নাগা সন্ন্যাসী তৈরি হয়ে থাকে। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি যাঁদের অকুণ্ঠিত নিষ্ঠা আছে এবং ধর্ম রক্ষার জন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে, প্রশ্নাতীতভাবে এগিয়ে এসে যাঁরা প্রাণ বলি দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে এরকম ইস্পাত কঠিন, অদম্য ব্যক্তিদেরই নাগা সন্ন্যাসে দীক্ষিত করা হয় যাতে এঁরা ঈশ্বরীয় চিন্তায় এক ভিন্ন ও উচ্চ মার্গে বিচরণ করতে পারেন। জাগতিক জীবনের কোনো কিছু এঁদের স্পর্শ করতে পারে না এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো, শুধুমাত্র কুম্ভমেলা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এঁদের যোগদান করতে দেখা যায় না। বাকি সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এঁরা যথাসম্ভব সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলে, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে জঙ্গলঘেরা পাহাড়ি এলাকার কন্দরে কন্দরে নিজেদের প্রথামতো সাধনা ও শস্ত্রচালনায় নিমগ্ন থাকেন। বিশেষ প্রতিকূল পরিস্থিতি কিংবা নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া আখড়ার বাইরে বের হতে দেখা যায় না। বেশিরভাগ নাগা সাধু থাকেন উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য এলাকায়। হিমশীতল ঠাণ্ডায় নগ্ন অথবা প্রায় নগ্ন অবস্থাতেও থাকেন অবিচল, নির্বিকার। আর কিছু থাকেন নর্মদার তীরবর্তী আধা পাহাড়ি, আধা জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় অতি শীতলতার মতো অতি উষ্ণ তাপমাত্রাও এঁদের বিচলিত করতে পারে না। নিয়মিত কৃচ্ছ্রসাধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে এটা রপ্ত করে ফেলেন তাঁরা।

তাহলে কি কেবলমাত্র শক্তসমর্থ যুবকরাই নাগা সন্ন্যাস নিতে পারেন? সবক্ষেত্রে তা নয়। চূড়ান্ত কৃচ্ছ্রসাধন এবং কঠোর ব্রহ্মচর্যে পোড় খাওয়া নাগা সন্ন্যাসীদের অনেকেই তৈরি হয়ে থাকেন একেবারে ৫-৬ বছরের বাল্য বয়স থেকে। তবে যুব বয়স থেকে সর্বোচ্চ ৪০ বছর বয়স পর্যন্তও অনেকে এই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। অনেকেই জানেন পাথুরে এলাকা ঠাণ্ডায় যেমন অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হয় গরমে তেমনি অতিরিক্ত উষ্ণ হয়ে থাকে। কিন্তু যত শীতল কিংবা যত উষ্ণই হোক না কেন নাগা সাধুরা কখনো মাটিতে ছাড়া কোনো কিছুর উপরে শয়ন করেন না। আখড়া জীবনের প্রথম থেকে বজ্রকঠোর নিয়মানুবর্তিতার ফলে ক্রমে ক্রমে এসব অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কেবল যুবক নয়, বালকদেরও নিয়মিত অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। অস্ত্রশস্ত্র চালনায় নাগা সাধুরা কতখানি পরিপক্ব ও পটু কুম্ভমেলায় শাহী স্নান যাত্রার সময় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। লাঠি, বল্লম, ত্রিশূল, তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে স্নান করতে যেতে দেখা যায় তাঁদের, প্রত্যেক কুম্ভমেলায় এটাও অন্যতম দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয়। আর আহার! সেও কঠিন নিয়মের বাঁধনে বাঁধা। দিনরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার স্বপাক অর্থাৎ নিজের হাতে রান্না করা সাত্ত্বিক আহার করেন। সেই আহার সংগ্রহ করতে হয় গুনে গুনে মাত্র ৭টি বাড়ি থেকে। তার বেশি বাড়ি থেকে ভিক্ষার অনুমতি মেলে না। যদি কারও কোনোদিন ভিক্ষান্ন না জোটে তবে সেদিন তাঁকে উপবাসে থাকতে হয়। অথচ এঁদের ভক্তের অভাব নেই। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিও এঁদের পরম ভক্ত। কিন্তু নাগা সাধুদের কাছে দানের অর্থে ভোজন কিংবা কিঞ্চিৎ বিলাসের জীবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কৃচ্ছ্রসাধন ও প্রশিক্ষণ সমস্ত দিক থেকে দক্ষ প্রমাণিত হলে তবেই শুধুমাত্র যুব নাগাদের 'সেনা' বা যোদ্ধা হিসেবে সন্ন্যাস লাভের অনুমতি মেলে।

নাগা সন্ন্যাসীদের জন্য নির্ধারিত পুঁথিগত বিদ্যা অনিবার্য নয়। নিয়মিত প্রবচনের মাধ্যমে ইতিহাস থেকে শুরু করে ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান সকলেই লাভ করে থাকেন। তবে নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে শিক্ষিত এমনকী উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা নিতান্ত হেলাফেলা করার মতো নয়। ১৩টি আখড়ার মধ্যে বিশেষ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম নিরঞ্জনী, আবাহন, শ্রীমহানির্বাণী, আনন্দ এবং অটল আখড়ায় অনেক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, এম-টেক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমনকী পিএইচডি ডিগ্রিধারী নাগা সন্ন্যাসী আছেন। জুনা আখড়ার সুপরিচিত মহামণ্ডলেশ্বর সোম গিরি ওরফে পাইলট বাবা-র মতো অনেক বিদেশি নাগা সন্ন্যাসীও আছেন। কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাইকে আখড়ার প্রথাগত নিয়ম পালন করতে হয়। যথারীতি সমস্ত রকমের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তবে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, তথাকথিত 'কিম্ভূতকিমাকার', 'হঠযোগী' নাগা সন্ন্যাসী ছাড়া কুম্ভমেলার কথা যেন ভাবাই যায় না। □

ধর্মান্ধতা রুখতে স্বামীজীর দর্শনই একমাত্র পথ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামীজীর বক্তৃতা সেদিন অভিভূত করেছিল গোটা বিশ্বকে। তিনি সেদিন বলেছিলেন— 'হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ আপনারা আমাদিগকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার উত্তরদানের জন্য আমি দণ্ডায়মান হইয়াছি। ইহাতে আজ আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বধর্মের প্রসূতিস্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং কি বলিব, পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দু জাতির ও যাবতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।'

শিকাগো শহরে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা আমেরিকাবাসীর মনে যে প্রভাব ফেলেছিল, সে সম্পর্কে স্বামীজী ১৮৯৩ সালের ২ নভেম্বর তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গাকে একটি পত্রে লিখেছেন— 'যখন আমি আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কানে যেন তালা ধরিয়া যায়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিন সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেইদিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল। সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকাবাসী আমাকে জানিতে পারিল।'

স্বামীজী শিকাগোয় পৌঁছে জানতে পেরেছিলেন আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র ছাড়া ওই মহাসম্মেলনে যোগ দেওয়া যাবে না। বস্টনে বসবাসের সময় ২৫ আগস্ট স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ হয় অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট প্রথমবার কথোপকথনে তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবহিত হন। স্বামীজী যখন তাঁকে জানান, সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক পরিচয়পত্র তাঁর নেই, তখন রাইট উত্তর দেন— 'To ask you, Swami, for your credentials is like asking the sun about its right to shine.' অধ্যাপক রাইট নিজেই স্বামীজীর একটি পরিচয়পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি লেখেন— 'স্বামীজী এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর পাণ্ডিত্য আমেরিকার সমগ্র পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মিলিত পাণ্ডিত্যের চেয়েও অনেক বেশি।'

নারীজাতির প্রতি স্বামীজীর কীরকম শ্রদ্ধা ছিল, তা তাঁর এক চিঠিতে জানা যায়। পাশ্চাত্যে নারীদের দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামীজী তাঁর এক ভক্ত হরিপদ মিত্রকে লেখেন— 'এদেশের (আমেরিকার) স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎ পুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মতো মেয়ে বড়োই কম। এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়িতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে, লেকচার দেবার বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কী না করে, বলতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হবে না। এদের মেয়েরা কী পবিত্র! ২৫ বৎসর, ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজগার, দোকান,

ফঃ ৫

কলেজ— সব কাজ করে, অথচ কী পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরিবদের উপকারে ব্যস্ত! এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা! এইরকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার জন আমাদের দেশে তৈরি করে মরতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব...।'

নারী স্বাধীনতার ব্যাখ্যা স্বামীজীর কাছে কীরকম ছিল, তা জানা যায় সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মৃতিচারণে— 'তোমরা আমারই মতো শক্ত সমর্থ। তোমাদের সাহায্য করতে যাব কোন দুঃখে? মহিলা বলে? ওটা হলো শিভালরি। বোঝ না কেন, ওই আচরণের মধ্যে নারী পুরুষের জৈবিক সম্পর্কের মনোভাবটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। রাজপুত রমণীরা তাঁদের স্বামীকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দিয়ে বলতেন— 'জয়ী হয়ে ফিরে এসো, নয়তো বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করো।' বীরত্বের এই অকুণ্ঠ চিন্তা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের নারীর মধ্যে পাওয়া যাবে?'

স্বামীজীর ভাষায়, ভারতমাতাই নারী চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। নারীর জননী ও জায়া রূপের মধ্যে জননী রূপটিকে অধিকতর গুরুত্ব দান করেছেন স্বামীজী। তিনি বলেছেন— 'ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব, সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীলা জননী। ...এই মাতৃত্বই নারীত্বকে পূর্ণ করে; মাতৃত্ব নারীর নারীত্ব। ভারতীয় নারীর সর্বংসহা রূপকে বিবেকানন্দ রামায়ণের সীতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সীতার মধ্যে কোনোরূপ প্রত্যাঘাতের অসদিচ্ছা ছিল না, বরং শত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সীতা নিজের সতীত্ব ও নারীত্বকে সর্বাংশে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, এ আদর্শ ভারতীয় নারীর। তাই তো স্বামীজী বলেছেন— 'হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।' সীতা সহিষ্ণুতার প্রতীক। সাবিত্রী সাহসিকতার প্রতীক। কারণ তিনি মৃত্যু দেবতার মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন। আর দময়ন্তী মানবতার প্রতীক— স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন একজন মানুষকে।'

'বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লিখিত হইবে--- বিবাদ নয়, সহায়তা। বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ। মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

— স্বামীজী

আবার দরিদ্র শ্রমজীবীদের লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেছেন, 'নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙলের ফলা হতে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওলার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে। ...আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরে না। এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পদ। এত শক্তি, এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত মুখটি, চুপকরে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম।' স্বামীজীর ভাষায় এই হলো ভারতের শ্রমিক সমাজ, এদেশের প্রকৃত নির্মাতা। দেশ গঠনের বিশ্বকর্মা।

স্বামীজী উপাসনা প্রসঙ্গে বলতেন, 'আমি ভয়ংকর রূপের উপাসক।' তিনি শিষ্যদের উদ্দেশে বলতেন— 'ভয়ংকরা মায়ের জন্যই যেন আমরা তাঁর ভয়ংকরা মূর্তির উপাসনা করি। এটা ভুল ধারণা যে, সকলেই সুখের আশায় কর্মে প্রবৃত্ত হন। বহুলোক জন্মাবধি দুঃখকে খুঁজে বেড়ান। তাঁরা আজন্ম মায়ের অসি-মুণ্ডু বরাভয় মূর্তির উপাসক।' ভাবাবেগে বলতেন— 'অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিভৃত হৃদয়কন্দরে মায়ের রুধিররঞ্জিত অসি ঝক্‌মক্ করে।' তাই তো তিনি লিখতে পেরেছিলেন মৃত্যুরূপা মাতা— "Kali the Mother— Who dares misery love,/ And hug the form of Death,/Dance in Destruction's dance,/To him the Mother Comes." যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়— "সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,/মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/কালনৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।" এ যে ভয়ংকরের পূজা। এ মৃত্যুর পূজা, এ যে কাপুরুষের আত্মহত্যা নয়। এ যে শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ। তাঁর ভাষা কঠোর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা তাঁর এই ভাব গ্রহণ করেই শক্তিমান হয়েছিলেন।

স্বামীজীর ধর্ম ও জীবন সাধনা ছিল সম্পূর্ণ মানব কেন্দ্রিক। সেজন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের মূল লক্ষ্য, 'বহুজন হিতায় চ, বহুজন সুখায় চ।' তাই তিনি মনে করতেন, 'প্রত্যেক ধর্মেরই অপর ধর্মগুলিকে স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক; ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অপরের কোনো বিশেষ ধারণাকে ভিন্ন মনে করিয়া নিন্দা করা উচিত নয়। ...ধর্মসমূহের মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকিলেও ওইগুলি শুধু সংকীর্ণতা ও অনুদায়তার জন্যই মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গল অধিক করিয়াছে।' (বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড)

নোবেল জয়ী ফরাসি উপন্যাসিক রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন— 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণীগুলি কেউ শুয়ে শুয়ে পড়লে তিনি উঠে বসেন। বসে বসে পড়লে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং দাঁড়িয়ে পড়লে দৌড়তে থাকেন।'

স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে ব্রিটিশ লেখিকা অ্যানি বেসান্ত লিখেছেন— 'A striking figure, clad in yellow and orange, shining like the sun of India in the midst of the heavy atmosphere of Chicago, a lion head, Piercing eyes, mobile lips, movement swift and abrupt.'

আজ থেকে ১৩১ বছর আগে ৩০ বছরের এক যুবক শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের সভায় ২৭ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের শেষ দিবসের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে তাঁর শেষ ভাষণের শেষ কথায় বলেছিলেন— 'বাধাপ্রদান সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লিখিত হইবে— বিবাদ নয়, সহায়তা। বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ। মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' সে সমন্বয়ের আজ বড়োই অভাব, তা দু'জন ব্যক্তির মধ্যে হোক কিংবা দুটি দেশের মধ্যে হোক। □

বিশেষ নিবন্ধ

সততার ধ্বজাধারী কমিউনিস্টরা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে জড়িত

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

আজকের পশ্চিমবঙ্গ যে নৈরাজ্যে ডুবছে তার পিছনে কমিউনিস্ট অসভ্যতা কাজ করছে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একটাও স্ক্যামের অভিযোগ না থাকলেও সারাক্ষণ কুৎসিত ইঙ্গিত করে চলেছেন কমিউনিস্টরা। আমরা দেখব কেরোলায় বাম জমানায় কী ঘটে চলেছে।

২০২০ সালে কেরোলার সোনা চোরাচালান মামলার আলোচনায় উঠে আসে স্বপ্না সুরেশ নামে এক আইটি পেশাদারের নাম। সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস ২০২০-র ৫ জুলাই স্বপ্না সুরেশ ও তার সঙ্গীদের কাছ থেকে ১৪.৮২ কোটি টাকা মূল্যের ২৪ ক্যারেটের ৩০ কিলোগ্রাম (৬৬ পাউন্ড) সোনা বাজেয়াপ্ত করে।

স্বপ্না সুরেশ আবুধাবি বিমানবন্দরে যাত্রীসেবা বিভাগে কাজ শুরু করেছিলেন। কিছুদিন পর দেশে ফিরে তিরুবনন্তপুরমে এক ট্রাভেল এজেন্সিতে দু'বছর কাজ করেন। ২০২১-এ তিনি মানবসম্পদ নির্বাহী পদে এয়ার ইন্ডিয়া স্যাটে কাজ শুরু করেন। কোম্পানিতে থাকাকালীন তিনি ১৭ জন মহিলা সহকর্মীর সই জাল করে সংস্থার কয়েকজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সহায়তায় এক পুরুষ সহকর্মীর বিরুদ্ধ যৌন হয়রানির মামলা করেন। সেই কর্মী স্বপ্না সুরেশের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু স্বপ্না প্রভাব খাটিয়ে তদন্ত বন্ধ করে দেয়।

স্বপ্না ২০১৬ সালে কেরালা রাজ্যস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের কনস্যুলেটে কনস্যুলেট জেনারেলের সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। একজন কূটনীতিকের পরিচয় ভাঁড়িয়ে সামাজিক, আমলাতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক উচ্চ মহলে দহরমমহরম তৈরি করেন। একই অফিস এক বছর আগে কোনো এক ফৌজদারি মামলায় তাকে বরখাস্ত করেছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের খুব ঘনিষ্ঠ একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার ও কেরালার তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এম শিবশঙ্কর স্বপ্না সুরেশকে কেরালা স্টেট ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (কেএসআইটিআইএল)-এর কাছে সুপারিশ করেছিলেন এবং তাকে ওই সংস্থায় মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে নিয়োগ করিয়েছিলেন।

তদন্তে প্রকাশ যে, এরপর এম শিবশঙ্কর তাকে জাল শিক্ষাগত নথি দিয়ে প্রাইসওয়াটার হাউস কুপার্সে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পাইয়ে দিয়েছিলেন। অল্পদিন পরেই এর জন্য প্রাইসওয়াটার হাউস কুপার্সের বিরুদ্ধে কেএসআইটিআইএল পুলিশি তদন্ত শুরু করে। কেএসআইটিআইএল আধিকারিকরা জানান স্বপ্না সুরেশ একজন স্নাতক হিসেবে চাকরির জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু পরে জানা গেছে তার বিদেশস্থিত এক ভাই মিডিয়াকে বলেছে যে তিনি রাজ্য স্কুল বোর্ডের পরীক্ষাও পাশ করেননি। একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে তার একজন প্রাক্তন সহকর্মীও তার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে তিনি কেবল দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন।' এহেন যোগ্যতার একজন কীভাবে রাজ্যক্ষমতার শীর্ষস্তরের ব্যক্তিত্বদের আনুকূল্য লাভ করে?

৯ মার্চ, ২০২৩ স্বপ্না অভিযোগ করেছিলেন যে কেরোলার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের নাম মামলা থেকে বাদ দেওয়ার বিনিময়ে তাকে ৩০ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফেসবুকে স্বপ্না দাবি করেছেন যে তাকে মুখ্যমন্ত্রী দেশ ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন। তিনি সিপিএম সম্পাদক গোবিন্দন মাস্টারের কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন, 'সিপিএম পার্টির সেক্রেটারি গোবিন্দন মাস্টার পিল্লাইকে বলেছিলেন আমাকে হুমকি দিয়ে এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলতে। তারা আমাকে পিনারাই বিজয়ন, তার মেয়ে ও ব্যবসায়ী ইউসুফ আলি সম্পর্কে কথা বলা বন্ধ করতে বলে। তারা আমাকে ৩০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল।'

এবার দ্বিতীয় ঘটনায় আসি। বাম-শাসিত কেরালার সামাজিক সুরক্ষা কল্যাণ কর্মসূচিতে এখন এমন সব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে যারা বিএমডবল্যু গাড়ির মালিক এবং সেই সমস্ত লোক যারা এসি ঘরে বাস করে। এদের অনেকেই জাল আয়ের শংসাপত্র জোগাড় করে গরিবের পেনশন আত্মসাৎ করেছে। বয়স্ক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ৬২ লক্ষ মানুষের জন্য প্রতি মাসে ১৬০০ টাকা পেনশন বরাদ্দ করেছে কেরোলা সরকার। এলডিএফ সরকার মালাপ্পুরম জেলার কোটাক্কাল মিউনিসিপ্যালিটির আধিরকারিকদের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে তদন্তে বেরিয়েছিল যে সাত নম্বর ওয়ার্ডের ৪২ জনের মধ্যে ৩৮ জনের ওই পেনশন পাওয়ার যোগ্যতা ছিল না। একজন তাদের মধ্যে বহুকাল আগেই মারা গিয়েছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কম্পিউটারাইজেশন ও নেটওয়ার্কিঙের দেখভাল করে তথ্য কেরোলা মিশন নামে এক সংস্থা। তারা এর আগে তদন্ত করেছিল। তাতে দেখা যায় যে ১৪৫৮ জন সরকারি কর্মচারী জালিয়াতি করে সামাজিক সুরক্ষা পেনশন প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করেছে। বেশিরভাগ জালিয়াতির ঘটনায় একেবারে গোড়ায় নিয়মভঙ্গ ঘটেছিল যোগ্যতা যাচাইয়ের বেলায়। কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছে সব সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের যোগ্যতা যাচাই নতুন করে করা হবে কোটাক্কাল মিউনিসিপ্যালিটিতে। কেরোলা সরকারের অর্থমন্ত্রী কে এন বেণুগোপাল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন উপকৃত ব্যক্তিদের নিয়মিতভাবে যোগ্যতা যাচাই করতে হবে। প্রায় ৬০ লক্ষ উপকৃত ব্যক্তির জন্য ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টাকা ঢুকেছে হাইস্কুলের শিক্ষক, অধ্যাপক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অ্যাকাউন্টে। এছাড়াও আছে বেশ কিছু সরকারি দপ্তরের শীর্ষকর্তা।

এই বাম দলগুলো শুধুমাত্র কলঙ্ক লেপনের জন্য নিত্যদিন আমেরিকান ডিপ স্টেটের কথায় আদানি ও তার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর নাম জড়িয়ে মিথ্যা আর্থিক অপবাদের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে চলেছে এবং এইভাবে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে বাধা দিয়ে দেশের সর্বনাশ করছে। কিন্তু নিজেদের দলের মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতির কথায় মুখে কুলুপ এঁটেছে। এরাই আবার আদানির টাকায় কেরালার ভিঝিনজামে বন্দর বানিয়েছে। □

এই বাম দলগুলো শুধুমাত্র কলঙ্ক লেপনের জন্য নিত্যদিন আমেরিকান ডিপ স্টেটের কথায় আদানি ও তার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর নাম জড়িয়ে মিথ্যা আর্থিক অপবাদের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে চলেছে এবং এইভাবে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে বাধা দিয়ে দেশের সর্বনাশ করছে।

নিত্য অনিত্যের ঊর্ধ্বে একটি স্থান—শ্মশান

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

বইটা শুরু করার জোর পাচ্ছিলাম না। ভেবেছিলাম মৃত্যু, স্তব্ধতা, প্রচণ্ড নীরবতার একটা বই হবে নিশ্চয়ই। বইটির নাম যে 'শ্মশান'। অলোক সরকারের 'শ্মশান' বইতে নীরবতা আছে কিন্তু পড়ার পর অনুভূত হয় এখানে নির্জনতা নেই। শ্মশানে রয়েছে সেই নির্বিকল্প বেদনার অনুভূতি, সঙ্গে আছে নিত্য অনিত্যের ঊর্ধ্বে এক সত্যের উপকণ্ঠ ঠিকানা। এখানে কোনো আজগুবি গল্প নেই, নেই কোনো শীতল আহ্বান। শ্মশান থেকেও যে কত টুকরো টুকরো তথ্য, দলিল মেলে, যারা ইতিহাসে পুড়ে যায় না চিতার আগুনে, তাদের জীবন্ত ছবি এই বই। যেমন, 'চিতা ও ছাই' অংশে অজয় নদীর তীরে ভাণ্ডারগড়িয়া নামের যে অখ্যাত গ্রামের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, যেখানে সতীদাহ হতো একটা সময় হামেশাই। ফুলি সতী হয়েছিল এখানে। লোক কাহিনিতে তা আজকেও টাটকা। তাঁর স্মরণেই আজ সেখানে সতীমা'র পূজা হয়।

শ্মশানের সন্ধানে যেভাবে ইতিহাসের পুনর্নবীকরণ লেখক করেছেন তা অনন্য। অত্যন্ত শ্রমসাধ্যও। মন ছুঁয়ে গেল স্মৃতির ছাই মাখা তল থেকে কবি শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রসঙ্গ। মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের কাটি গঙ্গার ধারে পাতালেশ্বর মন্দির এবং তার স্মৃতি ফলকে 'জেলার কবি' শব্দে লেখক যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সংবেদনশীল মননের সঙ্গে ফলকের ইতিহাসে ডুব দিয়েছেন, তা অতি অবশ্যই গবেষণা সত্তার পূর্ণ রূপ। অত্যন্ত স্পর্শকাতর মনে হয়েছে 'ডোমের দস্তানা' অধ্যায়টিও। যখন তাঁর মনে হচ্ছে ওই দস্তানা জোড়াই সেই সব প্রিয় মানুষের হাত, যেন অসমাপ্ত ভালোবাসার শেষ টান শেষ ইশারা... তা যেন শ্মশানের মাঝেও জীবনের ছবিকে, মৃত্যুর পরেও যে কাছের মানুষ বেঁচেই থাকে সেই চেতনাকে প্রগাঢ় সঞ্জীবনী সুধায় ভরিয়ে তোলে। বইটির লেখা পরতে পরতে উপলব্ধির সেই মধুরতা পেলাম— সত্যিই শ্মশানে তো সব শেষ হয় না। শ্মশানের প্রতিটি জিনিস আবার কেউ না কেউ ব্যবহার করে।

তখনই লেখকের সঙ্গে সহমত, চোখের আড়াল মানেই কি প্রস্থান? প্রস্থান

মানেই কি চলে যাওয়া? যা যা আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হলো সব ছাই সব শেষ, তার ওপরেই নতুন সাজের মহড়া শুরু হয়। আমাদের অগোচরে হয় তাই আমরা উল্লেখ করি না। শ্মশান শুনলে একটা বিষাদ স্তব্ধতা, গুমোট মন তৈরি হয়। লেখকের এই বই সেই বিষাদের সমুদ্রে বোধের প্রতিমূর্তি গড়তে সাহায্য করে। ডোমের মতো মৃত্যুর সঙ্গে সহজ হতে পারি না কেন— এই বই পড়তে পড়তে এই প্রশ্ন জেগেছে।

প্রিয়জনের না থাকাটা যে কী ভয়ংকর শূন্যতা এবং সে শূন্যতা পূর্ণ করার পথ আজকেও আমরা জানি না। প্রতিটা মুহূর্তে তিনি উঁকি দেন আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রয়াসে পারা না-পারায়। মনের কথা লিখেছেন লেখক— 'নেই মানুষ' হয়ে গেলেও আঁকড়ে থাকি তাকে। 'স্মৃতির স্মারক' অধ্যায়ের অংশ ২ ও ৫ সেই সবার জন্য অত্যন্ত সত্যি যারা প্রিয় মানুষটিকে কেন্দ্র করে নিত্য বাঁচে। শ্মশান ছেড়ে লেখক মনের কেন্দ্রে যেভাবে কড়া নেড়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তবে সহমত হতে পারিনি একটা ভাগে। 'তোমার প্রসাদ না দিয়ে খেতে পারি কিছু' অধ্যায়ের অংশ ২-তে যখন উল্লেখ করেছেন পুরুলিয়ার তেলকল শ্মশানের রীতি। যেখানে শূন্য চিতার সামনে চা-বিস্কুট। সিঙ্গাড়া। কুকুরে-পিঁপড়েতে-পাখিতে তা খায়। খুব স্বাভাবিক দৃশ্য। সেখানে লেখক উল্লেখ করেছেন 'পিঁপড়ের আদলে কী বাবা মিশে নেই।'

দর্শনবোধ এক অগাধ সমুদ্র। তাতে বিতর্ক থাকাটাও স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই কি ভাবা যায়— পিঁপড়ের আদলে আমার বাবা মিশে আছেন? আমরা প্রিয়জনকে সেইভাবে ভাবি যে ভাবে তিনি শেষবার মূর্ত হয়ে হাত ধরেছিলেন, কথা বলেছিলেন। যে আমার জীবন ভেলার পাল— তাকে পিঁপড়ে, পাখির আদলের সঙ্গে একাকার করা সাহিত্যে যথার্থ ঠেকলেও, বাস্তবে শ্মশানে ধুলো ঝেড়ে ভাবাটা বেশ অসম্ভব। তা জীবন সাধকরা পারবেন। এই বোধের গভীরতা বোঝা আর তা নিজের শোকে পালন করা এক নয়। মণিকর্ণিকা ঘাটের মতো 'শ্মশান' বইটি। বোধের চিতা জ্বলছে। যার শেষ হয় না। শ্মশান কত মানুষকে কাঙাল করে দেয়। শ্মশান সেই সব কাঙালদের খানিক নিরাপদ ঠিকানা। তবে এই বই পড়তে হলে, বুঝতে হলে প্রিয় মানুষ হারানোর ব্যথা পেতে হয়। তবেই এই বই স্থান পাবে পাঠকের মনে।

পুস্তকের নাম : শ্মশান : মানুষ পোড়া ধোঁয়ার নির্জন স্মৃতি। লেখকের নাম : অলোক সরকার। প্রকাশক : প্ল্যাটফর্ম এবং সুপ্রিম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। মূল্য : ৩২৫ টাকা।

কালিকাপুর উত্তরণ প্রযোজিত
‘এ কোন সকাল’

সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়

‘এ কোন সকাল’ নাটকটি এই সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী নাটক। নাটকটির লেখক সুদীপ্ত রায়। নাট্য চর্চা যাঁরা করেন তাঁরা চেষ্টা করেন প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে নাটক করতে। সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু কিছু নাটক এতটাই প্রাসঙ্গিক হয় যে দেখে মনে হয় এই তো এই নাটকটি খুঁজছিলাম। এই নাটকটিই চাই। এই সময় এর থেকে আর ভালো নাটক হতে পারে না। ‘এ কোন সকাল’ নাটকটির দ্বিতীয় শো গত ২৫ ডিসেম্বর Eastern Zonal Cultural Centre (EZCC)-তে মঞ্চস্থ হলো। নাটকের নির্দেশনা ও সামগ্রিক পরিকল্পনা যার তিনি হলেন অভিনেত্রী রীতা ঘোষাল। বহু বছর তিনি মঞ্চে ও ছোটো পর্দায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন। আর এই নাটকে তিনি একজন দক্ষ নির্দেশকের পরিচয় স্থাপন করতে পেরেছেন।

এই নাটকটি ‘রীতা ঘোষালের নির্দেশনায়’ প্রথম নাটক তা ভাবতে অবাক লাগছে। তার নির্দেশনা প্রশংসার দাবি রাখে। নাটকটিকে তিনি মুক্তমালার সঙ্গে গেঁথেছেন। প্রতিটি দৃশ্য ও অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল যেন চোখের সামনে ঘটনাগুলো ঘটছে। খুব বাস্তব লাগছিল নাটকটি। এই নাটকে উঠে এসেছে মহিলাদের সুরক্ষা এবং সমাজে তাদের অবস্থান। নরপশুদের হাতে ক্ষমতার আলিঙ্গনে তাদের লাঞ্ছনা। তিনি বারবার করে বলেছেন ধর্ষণ হলো একটি সামাজিক ব্যাধি যাকে গোড়া থেকে নির্মূল করে উৎখাত করতেই হবে। মেয়েরা যে ভোগপণ্য নয়, কোনো সম্পত্তি নয় সর্বপ্রথম একথা মানুষকে ভাবতে হবে। তাহলেই আমরা ধর্ষণকে রুখতে পারবো। তিনি আরও বলেছেন একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তারা তাদের অনুদান লাভের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর এবং তার জন্য এরা সমস্ত মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে পারে। তিনি এই বুদ্ধিজীবীদের চতুর্থ বাঁদরের আখ্যা দিয়েছেন।

পুলিশের চরিত্রটিও চোখে পড়ার মতো ছিল। তারা সবসময় প্রশাসনের ক্ষমতাবান লোকেদের কথায় ওঠাবসা করে অপরাধীদের সব অনৈতিক কাজ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের চরিত্রে মলয় ঘোষ তার খুব ধারালো অভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রটিকে বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। জনজাতি সমাজের একটি প্রতিবাদী মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হয়েছে যেহেতু ধর্ষক ছিল শাসক দলের ঘনিষ্ঠ, তাই শাসক দল উঠেপড়ে লেগেছে এই অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। শ্রীতমার মুখ্য চরিত্রে নির্দেশক রীতা ঘোষাল নিজেই অভিনয় করেছেন। শ্রীতমাকে দেখা গেছে মেয়েটির ন্যায়বিচারের দাবিতে লড়তে। তিনি একজন দক্ষ অভিনেত্রী বহু বছর ধরে নাট্য জগতে রয়েছেন। আগেও বিভিন্ন নাটকে তাকে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা গেছে। এই নাটকে শ্রীতমার চরিত্রে তার অভিনয় আবারও একবার দর্শককে মুগ্ধ করলো। শ্রীতমার দাদা এই নাটকে একজন বুদ্ধিজীবী, তাই তিনি তাকে প্রশ্ন করেছেন কেন আজ তারা চুপ? কেন তারা প্রতিবাদ করছে না। তার দাদা তাকে বারবার করে কেসটা তুলে নিতে বলছে তখন তিনি তার দাদাকে প্রশ্ন করেন, ‘তাহলে কি স্বার্থ সত্যের থেকে বড়ো’? কারণ তার দাদার ইচ্ছা ক্ষমতাবান কিছু লোকের সাহায্য নিয়ে একটা আর্ট স্কুল খোলা।

তাই কি তিনি চুপ! বারবার এই নাটকে উঠে এসেছে, ‘মেয়েরা কি শুধুই মেয়েমানুষ! মানুষ নয়?’ রীতা ঘোষাল এই নাটকে ধর্ষণকে তিনি একটি সামাজিক ব্যাধির আখ্যা দিয়েছেন। এই নাটকের মাধ্যমে তিনি একটা পচা গলার সিস্টেমের ভয়াবহ চেহারাটি তুলে ধরেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সিস্টেমের ভেতরে থেকেই সিস্টেমকে বদলাতে হবে। অভিনেত্রী রীতা ঘোষাল ছাড়া যাদের অভিনয়ের কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন বিনয়দার তরিত্রে প্রদীপ্ত রায় এবং আশিসদার চরিত্রে শঙ্খবরণ দাস। এছাড়া বউদির চরিত্রে সুদেষ্ণা নন্দী এবং বিপ্লব বোসের চরিত্রে শান্তনু হালদারের অভিনয় চোখে পড়ার মতো। এর সঙ্গে বলতে হয় দীপঙ্কর দে-র আলো এবং সব্যসাচী পালের সংগীত নাটকটি আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেকের অভিনয় চোখে পড়ার মতো। কুর্নিশ জানাই নির্দেশক রীতা ঘোষালকে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন শিল্প একটি কত বড়ো অস্ত্র হতে পারে।

মহাদাতা হরিশ্চন্দ্র

অযোধ্যার রাজা ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। তাঁর মনে খুব দয়া। একদিন ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি কয়েকটি বালিকার আর্তনাদ শুনতে পেলেনে। ক্ষত্রিয় বীর তিনি, তাতে আবার রাজা। নারীর আর্তনাদ শুনে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। আশ্রমের ভেতরে

প্রবেশ করে দেখলেন, কোথাও কেউ নেই, শুধু একটি গাছে পাঁচটি বালিকা লতা দিয়ে বাঁধা রয়েছে। তারাই আর্তনাদ করছিল। রাজা তরবারি দিয়ে লতার বাঁধন কেটে তাদের মুক্ত করে চলে এলেন।

বিশ্বামিত্র আশ্রমে ফিরে দেখলেন, বালিকাদের কেউ মুক্ত করে দিয়েছে। ধ্যানবলে বুঝলেন, কাজটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের। তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে হরিশ্চন্দ্রের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তিনি রাজাকে বললেন, তুমি কেন আমার আশ্রমে গিয়ে দেব-বালাদের বন্ধনমোচন করেছ? ওরা আশ্রমে এসে উৎপাত করে বলে আমি বেঁধে রেখেছিলাম। তুমি ওদের বন্ধনমোচন করে অন্যায় করেছ।

রাজা বললেন, আপনি আসন গ্রহণ করুন, শান্ত হোন মহর্ষি। আমি অত বুঝিনি, ভেবেছিলাম কোনো দুর্বৃত্ত তাদের ওই দুর্দশা করেছে। তাই আমি ওদের উদ্ধার করেছি। রাজার যা কর্তব্য তাই আমি করেছি।

বিশ্বামিত্র বলেলেন, রাজার ধর্ম সমস্তই কি তুমি পালন করো?

—হ্যাঁ মহর্ষি, কোনো তো ত্রুটি করি না।

—রাজার কর্তব্য ঋষিদের দান করা, তা তুমি কর?

—হ্যাঁ তা করি। তাঁরা যে আদেশ করেন, আমি তা পালন করি।

—আচ্ছা, আমি আদেশ করছি, আমাকে দান কর।

—আপনি যা আদেশ করবেন তাই করব।

—তাই যদি হয়, তবে হে পৃথিবীপতি, তুমি আমাকে পৃথিবী দান কর।

—বেশ, আপনাকে দান করলাম। আপনি এই সিংহাসনে বসুন। রাজ্য, রাজপ্রসাদ সব আপনার। আমি বনে চললাম।

—যাবে কোথায়? দানের দক্ষিণা দিয়ে যেতে হবে।

—বেশ তো রাজভাণ্ডার থেকে এনে দক্ষিণা দিচ্ছি।

— রাজভাণ্ডার তো এখন আমার। সে তো আগেই আমাকে দিয়ে দিয়েছ। তাতে তোমার আর অধিকার নেই। কাশীধাম পৃথিবীর বাইরে, তুমি সেখানে গিয়ে বাস করতে পারো। আর যে করেই হোক দানের দক্ষিণা শোধ কর।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পথে বের হলেন। কাশীধামে এসে এক ব্রাহ্মণের কাছে স্ত্রী ও পুত্রকে বিক্রি করে কিছু অর্থ পেলেন কিন্তু তাতে পুরো দক্ষিণা শোধ হলো না। তখন রাজা মণিকর্ণিকা ঘাটে এক চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রি করে যে অর্থ পেলেন, তাতে পুরো দক্ষিণা শোধ হলো।

মহারানি শৈব্যা সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করেন, আর পুত্র রোহিতাশ্ব পূজার ফুল তুলে আনার কাজ করে। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে রোহিতাশ্বকে সাপে কামড়ালে তার মৃত্যু হয়। তখন শৈব্যা মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটে এলেন দাহ করাতে।

এদিকে হরিশ্চন্দ্র সেই চণ্ডালের শুয়োর চরানো আর শ্মশানঘাটে মড়া পোড়ানোর কাজ করেন। তিনি প্রতিটি শবের জন্য পঞ্চাশ কাহন কড়ি নেন। চণ্ডালের দাসত্ব করে হরিশ্চন্দ্রের চেহারাও চণ্ডালের মতোই বিকটদর্শন হয়েছে। অন্ধকার রাত্রি। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শৈব্যা মৃতপুত্র কোলে নিয়ে শ্মশানে বসে আছেন। হরিশ্চন্দ্র প্রকাণ্ড লাঠি হাতে সেখানে এসে গর্জন করে বললেন, কে রে অভাগিনী! পঞ্চাশ কাহন কড়ি দে, নইলে চিতা জ্বালাব না।

— সর্দার, আমি বড়ো দুঃখিনী। এক ব্রাহ্মণের দাসী। আমার একমাত্র পুত্রকে দাহ করাতে এসেছি। আমার কোনো সম্বল নেই। একটা কানাকড়িও নেই। তুমি দয়া করে দাহ করে দাও।

—না, কড়ি না দিলে দাহ হবে না।

— তবে কি আমার বাছাকে শেয়াল কুকুকে ছিঁড়ে খাবে?

— কড়ি না থাকলে তাই-ই হয়। আমি হুকুমের চাকর। দয়া মায়া দেখাবার উপায় নেই আমার। যে কাঙাল তার ছেলের আবার কী গতি হবে?

— ওগো আমি কাঙাল ছিলাম না। এ কাঙালের ছেলে নয়। এ রাজপুত্র। হায় হায় হরিশ্চন্দ্র, কী সর্বনেশে তোমার দান। কী ভয়ানক তোমার রাজধর্ম! তুমি সমস্ত রাজ্য দান করলে আর তোমার একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ একমুঠো কাঠের অভাবে শেয়াল কুকুরের মুখে পড়বে। হায় ঋষি বিশ্বামিত্র! তোমার মতো নিষ্ঠুর আর কে আছে?

—হরিশ্চন্দ্র! কে সে? আমিই রাজা হরিশ্চন্দ্র ছিলাম না! অ্যাঁ, তুমিই কি আমার শৈব্যা?

হরিশ্চন্দ্র মৃত পুত্রের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দু'জনেরই সংজ্ঞা লোপ পেল। সংজ্ঞা ফিরে এলে হরিশ্চন্দ্র বললেন— রানি, আমাদের একমাত্র পুত্র যখন মারা গিয়েছে, তখন আমাদের আর বেঁচে থেকে কী লাভ। এসো, চিতা সাজিয়ে দু'জনেই প্রাণত্যাগ করি।

জ্বলন্ত চিতায় দু'জনে ঝাঁপ দিতে যাবেন এমন সময়ে ধর্মরাজ আবির্ভূত হয়ে রোহিতাশ্বকে বাঁচিয়ে দিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র নিকটেই অপেক্ষা করছিলেন, তিনি প্রকট হয়ে বললেন, মহারাজ, তোমার পরীক্ষা আজ শেষ হলো। তোমাকে সবকিছু ফিরিয়ে দিলাম। আমি আমার আশ্রমে চললাম। দান করা জিনিস বিনামূল্যে নিতে নেই, তাই সাতটি কড়ি দিয়ে তুমি সব কিনে নাও। ধন্য তোমার ত্যাগ, ধন্য তোমার দানশীলতা, ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা। তোমার কীর্তি স্বর্গে, মর্ত্যে অমর হয়ে থাকবে।

(শাশ্বত ভারত থেকে গৃহীত)

জাতীয় উদ্যান

রাজবাড়ি

ত্রিপুরা রাজ্যের জয়চন্দ্রপুর জেলায় অবস্থিত। এক প্রকার বাইসনকে রক্ষা করার জন্য ২০০৭ সালে উদ্যানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উদ্যান জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এখানে অনেক জলাশয় ও নদী রয়েছে। এখানে ২৩০ রকমের গাছ, ১১০ রকমের ঝোপঝাড়, ১৫০ রকমের লতা এবং ৪০০ রকমের ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। এছাড়া প্রচুর পরিমাণে বাঁশ রয়েছে। বাইসনের পছন্দের খাবার এই বাঁশ। ফুলবৈচিত্র্যের জন্যও উদ্যানটি সুপরিচিত। এই উদ্যানের প্রদান আকর্ষণ বাইসন হলেও অন্যান্য অসংখ্য জীবজন্তু রয়েছে। বন্য শুয়োর, বনবেড়াল, চিতাবাঘ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর রয়েছে। সারা বছর পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে রাজবাড়ি ন্যাশনাল পার্কে।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৫১

आकारान्त – स्त्रीलिङ्गे

क्लीवलिङ्गे

तत् – तानि (সেটি – সেগুলি)

तानि – कानि ? (সেগুলি কী ?)

ते के ? (তারা কারা ?)

तत चित्रम् – तानि चित्रानि (সেটি ছবি– সেগুলি ছবি)

अभ्यास कुर्मः--

तत् पुस्तकम–तानि पुस्तकानि। तत् गृहम् –तानि गृहानि। तत् कङ्कतम् –तानि कङ्कतानि। तत् भवनम् –तानि भवनानि। तत् पुष्पम् –तानि पुष्पाणि। तत् मन्दिरम् –तानि मन्दिराणि।

प्रयोग कुर्मः

वाक्यम् , पदम् , छत्रम् , मित्रम, वचनम् , कार्यम् , सिंहासनम् , राज्यम, व्यजनम् , विमानम् ।

ভালো কথা

লালির বাছুর

কদিন আগে আমাদের লালির একটা বাছুর হয়েছে। সারা গা সাদা ধবধবে। শুধু কপালে লাল তিলকের মতো। এখন লালি কাউকে কাছে যেতে দেয় না। শুধু মাকে আর আমাকে কিছু বলে না। আমি ওর বাছুরের গায়ে হাত দিতেই ছুটে দূরে চলে যায়। তখন ওর মা হাম্বা করলেই আবার ছুটে আসে। ওর কাছে এখন কেউ যেতে পারে না। সেদিন আমাদের ভুলু ওর বাছুরটাকে একটু আদর করছিল। তখন লালি শিং দিয়ে এমন গুঁতিয়ে দিয়েছে যে কেঁউ কেঁউ করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিল। ভুলু আর ভুলেও ওর বাছুরের কাছে আসে না। শুধু আমার কাছে আসে, আমি গায়ে হাত দিতেই আবার ছুটে এদিক ওদিক চলে যায়, পরক্ষণেই আবার ছুটে কাছে চলে আসে।

অর্ণব রক্ষিত, সপ্তম শ্রেণী, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভোরবেলা

সায়ন্তনী সাহা, দশম শ্রেণী, আগরতলা, ত্রিপুরা

ভোরবেলা কাক ডাকে কা কা
ঠাকুরদা বলে চা চা,
ঠাকুমা বলে রাধে রাধে
মা তখন চুল বাঁধে।
বড়দা তখন ডন মারে
ছোড়দি বসে গলা সাধে,
তখনো কাক কা- কা–
আর ঠাকুরদা চা- চা–।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

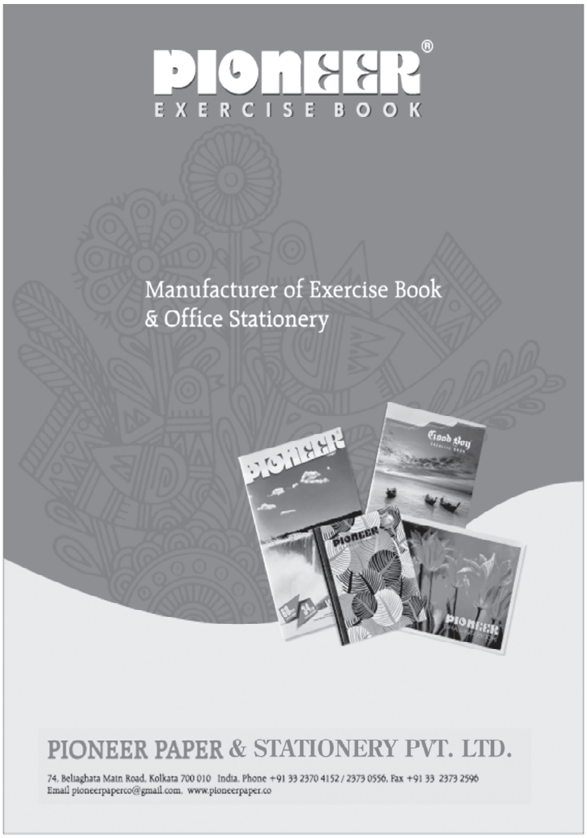

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

দুই মহাসন্ধিক্ষণে ভারসমন্বয়ের বার্তাবাহক তথাগত বুদ্ধ ও স্বামী বিবেকানন্দ

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাল নিরবধি। আকাশের মতো নিঃসীম ও নিরালম্ব। তথাপি মানুষের প্রয়োজনে তাকে আমরা ভাগ করি, তাকে ছেদ করে কাল্পনিক যুগ, শতাব্দী, বর্ষ রচনা করি। মানুষের জীবনসমুদ্রে মাঝে মাঝে আবর্ত আসে, চারদিক হতে জলস্রোতের একমুখী হয়ে সংকট সৃষ্টি করে, একেই আমরা যুগসন্ধি বলি।

আজ আমরা এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণে। ইতিহাসের চলার পথে নানা ভাবের নানা স্রোতের সংঘর্ষ বেঁধেছে। এই দুঃখতমসা, গভীর এই নিশীথ রাত্রি শেষ কথা নয়। এর শেষে আছে নব আশার দীপ্ত সমুজ্জ্বল প্রভাত। সে প্রভাতের বর্ণরাগ আপনাআপনি ফুটবে না। তার জন্য চাই সাধনা। তার জন্য চাই নব দৃষ্টিভঙ্গি, নব প্রচেষ্টা।

এই সাধনা আশাতুর সাধনা। তার লক্ষ্য ভাবীকালে, তার আশা প্রদীপ্ত ভবিষ্যৎ, কিন্তু ভবিষ্যৎ তো অবিচ্ছিন্ন নয়, অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ। এই যুগ সন্ধিক্ষণে অতীতের যুগ সন্ধিক্ষণের কথা স্মরণ করবো।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'চক্র' শব্দটির বিশেষ দ্যোতনা আছে। ভারত ইতিহাসের ক্রান্তিকালে পার্থসারথির হাতে সুদর্শনচক্র কুরুক্ষেত্র রণে ঝলমলিয়ে উঠেছিল। দুর্যোধন, দুঃশাসন, জরাসন্ধ, কংস প্রভৃতি দুরাচারী মানুষের অত্যাচার, অনাচার, অবিচার থেকে সৎ মানুষ ও সৎভাবনা রক্ষা করার জন্য এই চক্র।

পরবর্তীকালে দেখি, 'ধর্মচক্র' প্রবর্তন করেছেন তথাগত বুদ্ধ বারাণসীতে। এখন স্বামীজী বলেছেন, 'মহাযুগচক্রের' কথা এবং যুগচক্র প্রবর্তনে সহায়তার কথা। ধর্মগুরু, বিজ্ঞানী, দেশভক্ত, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী প্রমুখ বিদ্বজ্জন কথাটি নানাভাবে দেখেছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন।

সত্য চিরন্তন, সত্য সার্বভৌমিক। মহৎ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে তা নতুন রূপ নেয়, সেটাই মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য।

তথাগত বুদ্ধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তাঁর সার্বভৌমিক রূপ। আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববোধ আধুনিক মনোভাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হলেও বিশ্বমানবতার প্রসার যথোচিত হচ্ছে না। মানুষ আজও স্বাদেশিকতার আড়াল তুলে রণতাণ্ডবে মত্ত হচ্ছে। আড়াই হাজার বছর আগে তথাগত বুদ্ধ যে দীপ জ্বালালেন, সে দীপ কোনো বিশেষ জাতির, কোনো বিশেষ দেশের নয়। ইহুদিরা ভাবতো তারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র, তাদের জন্যই ধর্ম বিকশিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধের বাণী নির্বাচিত কোনো সম্প্রদায় বা জাতির নয়, তাঁর শিক্ষা সার্বজনীন ও সার্বভৌম। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রবাহিত ও ব্যাপ্ত করেছেন, মহারাজ অশোক তেমনিই বুদ্ধের বাণীকে বিশ্বজনীন করেছেন।

বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় অবদান তাঁর যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। যখন বিজ্ঞান মানুষের জীবনে আজকের মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, সেই প্রাচীনকালে তথাগত বুদ্ধ আপন ধর্মকে নিরঙ্কুশ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা

করে গেছেন।

বুদ্ধদেব সমকালীন যুগের প্রয়োজনীয়তাকে অনন্যসুলভ প্রাঞ্জলতায় ব্যক্ত করেছেন। দর্শনের কচকচি নয়, কল্যাণ ও মঙ্গলের জীবনবৃত্ত বারবার অনুসরণের কথা বলেছেন। নির্বাণের শান্তি মানুষের কাম্য। মঝ্‌ঝিম সূত্রে তিনি একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন, একজনের দেহে বিষাক্ত তির লেগেছে, সে যদি তৎক্ষণাৎ তির না উঠিয়ে তির নির্মাতা কে, কে তির নিক্ষেপকারী। কী তার উদ্দেশ্য— এইসব বিষয় আলোচনা করে, সে যেমন অর্বাচীনের মতো কাজ করে তেমনিই আমি ব্যাধি শোকতাপ জর্জর মানুষে নির্বাণের পথ সন্ধান না করে পৃথিবী ও আত্মার তত্ত্বানুশীলন করি, তবে তা মূর্খতারই পরিচয় হবে।

বুদ্ধের সাধনায় শীলপালন নির্বাণলাভের পন্থা। এই সুখকর শীলগুলি চরিত্রকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করে তোলে। তাই আজীবন এটি পালন করা বিধেয়। তিনি সংযম, ইন্দ্রিয় জয় ও চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু চরিত্র শুধু Puritanism নয়, শুষ্ক বৈরাগ্য নয়। তা হলো দয়া, দাক্ষিণ্য, মৈত্রীমূলক কল্যাণব্রত।

বৌদ্ধসাধকের ভাবনায় পঞ্চবিধ ভাগ— মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, উপেক্ষা ও অশুভা। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত জগতের কল্যাণ কামনা— স্থাবর জঙ্গম চরাচরের মৈত্রী ভাবনা— যেখানে যত প্রাণী আছে তারা সকলেই যেন ক্লেশ, পীড়া ও অসৎ আকাঙ্ক্ষার কবল হতে মুক্তিলাভ করে। দ্বিতীয় অনুশীলন হলো করুণা ভাবনা–– জীবের দুঃখ নিবৃত্তির অনুষ্ঠান। সংসারে যে দুঃখ দারিদ্র্য, তাতে তাঁর চিত্ত ব্যাকুল হয়। তৃতীয় মুদিতা ভাবনা— সাধকের চিত্তে সৃষ্টি হবে আনন্দের উৎস যে আনন্দ তার দৃষ্টি খুলবে, যার

ফ ঃ ৬

মধ্য দিয়ে শ্রী ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হবে। ধীরে ধীরে দৃষ্টির প্রসার হবে যার মধ্য দিয়ে পল্লী, সমাজ, দেশ প্রভৃতি অতিক্রম করে বিশ্বমানব ও বিশ্বজগৎকে ভালোবাসতে শিখবে।

তার পরবর্তী ভাব আত্ম-সম্পর্কীয়। দেহপ্রীতি ভুলে সৌভাগ্যের প্রতি বিতৃষ্ণ। কেউ প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, উপেক্ষা কামনাপরিশূন্য অবস্থা। এই উপেক্ষা ভাবকেই সর্বোচ্চ ভাব বলেন। উপেক্ষা ভাবের সঙ্গে শ্রীশ্রীগীতার স্থিতধী ভাব অবশ্যই তুলনীয়—

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।

শ্রীশ্রীগীতার অনুশাসন ও বুদ্ধানুশাসনের মধ্যে সৌসাদৃশ্য পাঠক অনুপ্রাণিত হন। উভয় সাধনাই মানুষকে নিরাসক্ত ও নির্বাসনা হতে বারবার উপদেশ দিয়েছে। বুদ্ধের ভাষায়, 'উৎসকেসু মনুসুখেসু বিহরাম অনুস্সুক।'

বুদ্ধের আরেকটি অবদান হলো Intensely Positive attitude toward the World। আত্মতত্ত্বের গহনপথে পথ হারিয়ে সুন্দর পৃথিবীর জীবনের প্রতি অনেকে বিমুখ হয়েছিল। বুদ্ধের প্রেমের বাণী, সেবার বাণী এবং কল্যাণব্রত মানুষের দৃষ্টি ফেরাল।

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জল্পনা অনেক হয়েছে। এদেশের দীনতম লোকও অনেক দার্শনিক সত্য জানে, তার ফল ব্যর্থ হয়েছে। কারণ দার্শনিকতা মানুষকে বড়ো করে না। বড়ো করে চরিত্র। আমাদের বিরাট অধঃপতন চরিত্রহীনতা।

বুদ্ধের আরেক অবদান কর্মতত্ত্ব। কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। বুদ্ধের কর্মবাদ Fatalism নয়। বুদ্ধ মানবাত্মাকে কর্মের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধের যুগ এবং ভাব, ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে বর্তমান যুগের প্রভাত সূর্যোদয়ের ভগীরথ স্বামীজীর দিকে দৃষ্টি ফেরাই। স্বামীজীর কর্মরহস্য অবশ্যই আমাদের প্রেরণা। তাঁর ভক্তিযোগের প্রথম কথা হলো অকপটতা।

স্বামীজী স্পষ্ট উক্তি— ধর্মভূমি ভারতবর্ষ নরকভূমিতে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের চলমান ধারায় ভারতবাসী সদাচার ভ্রষ্টা, বৈরাগ্যহীন ও একমাত্র লোকাচার নিষ্ঠ। সনাতন ধর্ম বহু খণ্ডে বিভক্ত। ধর্মের মূল স্বরূপ খুঁজে পাওয়াই এক গবেষণার কাজ। বহু শাখায় বিকীর্ণ স্রোতস্বিনীর উৎস সন্ধানই সমস্যা। নিজ নিজ মতে বিশ্বাসী মানুষ আপনার পথটাই একমাত্র সত্য ভেবে নিজেদের মধ্যে কলহ, প্রতিযোগিতা ও আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন। ভারতের জীবনধারার উপর জ্ঞান-বিজ্ঞান সচেতন ভারতবাসী বিতৃষ্ণ ও সংশয়াচ্ছন্ন।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যাবে প্রাচীন প্রথা ও অন্ধবিশ্বাস গোটা মধ্যযুগে ভারতবর্ষকে ঢেকে রেখেছে। স্বাধীন চিন্তা নেই বললেই চলে। ধর্ম মানে আনুষ্ঠানিকতা। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিলুপ্তির পথে।

ধর্ম, সমাজ ও দেশের এই চরম বিপর্যয়ের সঙ্গে পশ্চিমি জগতের চোখ ঝলসানো প্রযুক্তিতে আকৃষ্ট ব্যক্তিরা ভারতীয় জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন। ভারতবর্ষের এই পতনের গভীরতা অতলস্পর্শী। এর থেকে মুক্তির জন্য অনন্যসাধারণ বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যুগাচার্য অনুভব করেছিলেন ভারতের নাড়ীর স্পন্দন। ইতিহাস চেতনার ফলে তিনি বুঝেছিলেন, জগতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যুগের অবসান ঘটেছে, বুঝেছিলেন বৈশ্যযুগ চলছে এবং শীঘ্র শূদ্রযুগ আসবে।

ভারত ইতিহাসের সংকটলগ্নকে স্বামীজী বলেছেন, 'মহাযুগের প্রত্যুষ'—'মহাযুগচক্র' প্রবর্তনের কাল। প্রথমটি গভীর বলে আবির্ভাবটিও বিরাট। প্রবাহিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়। পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। ভারতে ভগবান শরীর গ্রহণ করে আবির্ভূত হয়েছেন। দেবালোক অন্ধকার দূর করেছে। এবারের বেগে যেমন সাঙ্ঘাতিক, ভেষজ তেমনি কড়া, আবার বৈদ্য বরিষ্ঠ।

বুদ্ধের মতো বিবেকানন্দের স্বার্থহীন কর্ম ঈশ্বরের পরমপ্রীতি অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী এক চৈতন্যের অনুভূতি; সেগুলি সর্বকালিক ও সার্বভৌমিক।

জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমৈত্রীর কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতে জাতির প্রতিষ্ঠা হলে তার প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে পাশ্চাত্যে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রচার, বিভিন্ন দেশের শক্তি ও সংস্কৃতির সাহায্যে সমগ্র মানবজাতি উন্নত হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান জানালেন, নবযুগ প্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকিত পথে মহাযুগচক্র প্রবর্তনের সহায়তা করার জন্য। সর্বভাবের সমন্বয়ে গড়া এই নব যুগধর্ম সমগ্র জগৎ বিশেষত ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান এর জন্য চেয়েছেন চরিত্রবান যুবক। সেজন্য চাই— এমন লোক যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত। আর তার মধ্যে থাকার এমন একটি মন যা বজ্রের উপাদানে গঠিত বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ। বীর্যবান সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী যুবা। তবেই ঘটবে মহাযুগচক্র প্রবর্তন— সদ্যনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট দিব্যপথে। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বিদেশনীতির পর্যালোচনা

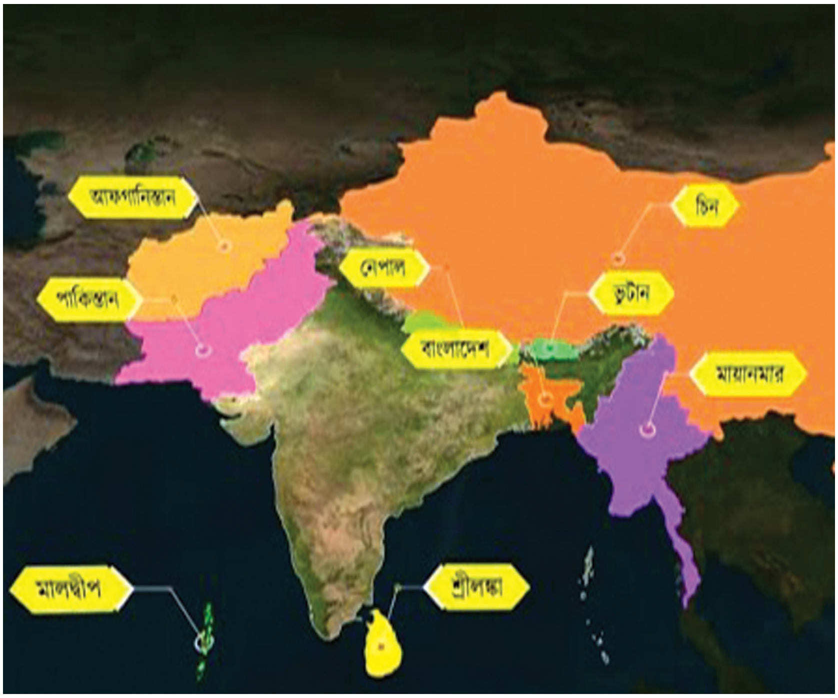

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৯৮৩ সালে দশম শ্রেণীর ইংরেজি সিলেবাসে একটা প্যারাবল (গল্প) পড়ানো হতো। সেখানে জিসাস ক্রাইসট তার ভক্তদের গল্পের ছলে বোঝাচ্ছেন, প্রকৃত প্রতিবেশী কাকে বলে? তিনি বললেন, একজন মানুষের বিপদে যারা পাশে দাঁড়ায় তারাই তার প্রকৃত প্রতিবেশী। কিন্তু পাশাপাশি বসবাস করলেই কেউ প্রতিবেশী হয়ে যায় না। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রও ছিলেন একজন সাহিত্যিক। দাদার মতো এত বড়ো মাপের সাহিত্যিক না হলেও তিনি অনেক পুস্তক লিখে গেছেন। তার একটি নামকরা ভ্রমণ সাহিত্য হলো 'পালামৌ'। সেখানে তিনি প্রতিবেশী সম্পর্কে মজার কথা বলেছেন— 'বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন, খারাপ প্রতিবেশীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী। যাদের প্রতিবেশী নেই তাদের রাগ নেই, তাদেরই নাম ঋষি। ঋষিদের কোনো প্রতিবেশী থাকে না। ঋষির আশ্রমের পাশে প্রতিবেশী বসাও দেখবে তিনদিনের মধ্যেই তাদের ঋষিত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রথম দিনেই প্রতিবেশীর ছাগল ঋষির ফুল গাছের ফুল পাতা খেয়ে শেষ করবে, দ্বিতীয় দিন প্রতিবেশীর গোরু এসে ঋষির কমণ্ডলু ভাঙবে, তৃতীয় দিন প্রতিবেশী গিন্নি এসে ঋষিপত্নীকে নিজের গয়না দেখাবে। ব্যাস, ঋষির ঋষিত্বের দফারফা!'

সাহিত্যিক সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথাগুলো খুব মজা করে বলেছেন কিন্তু তার মর্মার্থ গভীর। আমরা ব্যক্তিগত জীবনেও দেখি প্রতিবেশীদের নিয়ে মানুষের কিছু না কিছু ক্ষোভ থাকে, থাকে জ্বালা ধরানো অনুভূতি। কোনো ব্যক্তি জ্ঞানগম্মি, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এগিয়ে থাকলে সাধারণত তার প্রতিবেশীরা যারা এসবে পিছিয়ে থাকে তারা ঈর্ষান্বিত হয় এবং মনে মনে সেই প্রতিবেশীর অমঙ্গল কামনা করে। সামনাসামনি কিছু বলে না, তার কারণ বলার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু সেই বলিষ্ঠ প্রতিবেশী বেকায়দায় পড়লে, শত্রুতার শিকার হলে তার শত্রুকে সমর্থন দিয়ে তাকে আরও দুর্বল করতে চায়। এটা যেমন মনুষ্য চরিত্র তেমনি রাষ্ট্রীয় চরিত্রও বটে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের রসায়ন, তার ওঠা পড়া এবং হাল হকিকত বিচার করলে অনুরূপ ছবি উঠে আসে।

ভারতের বৃহৎ ও শক্তিশালী প্রতিবেশী চীন। চীন সবদিক দিয়ে ভারতের থেকে এগিয়ে থাকলেও দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রধান প্রতিপক্ষের নাম ভারত। এজন্য সে সবসময় চায় ভারতের অগ্রগতিকে রুখে দিতে। এটা করা যায় নানানভাবে। দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও কলহ সৃষ্টির মাধ্যমে বা সেই দেশকে সামরিক খাতে বরাদ্দ বাড়াতে বাধ্য করে। দেশের অভ্যন্তরে মাওবাদী, অতিবামদের ক্রিয়াকলাপ সেসব এলাকায় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। এই মাওবাদীদের পৃষ্ঠপোষক হলো চীন। এছাড়া চীন ভারতের সীমান্তে সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতি তৈরির মাধ্যমে এবং সেনা সমাবেশ করে ভারতকে বাধ্য করেছে সামরিক খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে। কোনো দেশের পরিষেবা খাতে লগ্নি দেশটিকে মজবুত অর্থনীতি প্রদান করে, কিন্তু সামরিক খাতে বরাদ্দ দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতিতে কোনো ভূমিকাই রাখে না। যে কারণে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামরিক খাতে লগ্নি সমরৈখিক নয়, এদের অবস্থান সর্বদাই বিপ্রতীপ।

ইতিপূর্বে ১৯৬৫ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের পরাজয় হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 'হিন্দি চিনি ভাই ভাই' স্লোগান তুলে মন ভেজাতে পারেননি, তাদের মন জয় করা সম্ভব হয়নি। ভারতের জন্য চীনের বিদেশ নীতির প্রধান কৌশল হচ্ছে ভারতকে সামরিকভাবে চাপে রাখা। তাই বর্তমান ভারত সরকার চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করার যত চেষ্টাই করুক না কেন তা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের এই যে রসায়ন এটাই

ভারতকে মেনে নিতে হবে এবং সেটাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে শক্তিশালী দেশগুলো ভূ-কৌশলগত অবস্থানের নিরিখে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষের সঙ্গে নীবিড় সম্পর্ক গড়তে তৎপর, অন্তত ইদানীংকালে তার কার্যকলাপ তা বলে দেয়।

বর্তমান বিশ্ববাজার অর্থনীতিতে আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর নামটি চীন। তাই আমেরিকা চাইবে চীনকে চাপে রাখতে এবং চীনকে চাপে রাখার জন্য চীনের বৃহৎ প্রতিবেশী সম্ভাবনাময় বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি ভারতকে তোল্লা দিতে। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির মাধমে চীন ভারত মহাসাগর অঞ্চলে নিজের সামরিক উপস্থিতি ও প্রভাব বৃদ্ধি করতে চায়। এভাবে চারদিক থেকে ভারতকে ঘিরে ফেলতে চায় যাতে নিরাপত্তাজনিত এক অস্থিরতা সব সময় তাকে গ্রাস করে। ভারত প্রত্যেকটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে চীনের এই মনোভাবের কট্টর সমালোচনা করে থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ছাড়াও আরও যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মঞ্চগুলো রয়েছে যেমন ব্রিকস, (ভারত রাশিয়া ব্রাজিল চীন দক্ষিণ আফ্রিকা, মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা এইসব দেশের আদ্যক্ষর নিয়ে ইহা গঠিত), আসিয়ান, কোয়াড (ভারত অস্ট্রেলিয়া জাপান আমেরিকা) প্রত্যেকটিতে ভারতের উজ্জ্বল ও দীপ্ত উপস্থিতি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে এবং সামরিক শক্তিতে আমেরিকার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন লড়াই রয়েছে চীনের। চীন কখনোই চায় না ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক দৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী হোক, যেমনটা রাশিয়া চায় না তার প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেন এনএটিও-র সদস্যপদ পাক। যে কারণে আজ দু'বছর ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। সেই একই কারণে চার বছর ধরে লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তে চীনের সমরসজ্জা। ভারত আমেরিকার সঙ্গে মাখো মাখো সম্পর্কের ইতি টানলে চীন তার সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতোই একটা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াবে বলে প্রতিবেদকের বিশ্বাস। ভারতের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও চীন কখনোই ভারতের সঙ্গে স্থায়ী সীমান্ত টানায় আগ্রহী নয়। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিতর্ক সে জিইয়ে রাখতে চায়। ভারতকে চাপে রাখা তথা প্রয়োজনে আক্রমণ করার অপযুক্ত কারণ সে সবসময় হাতে রাখতে চায়। বর্তমান বিশ্বে বিবদমান দেশগুলোর (ইরান-ইজরাইল, রাশিয়া-ইউক্রেন, গ্রিস-তুরস্ক, সৌদি আরব-ইরান, জাপান-রাশিয়া) সবার সঙ্গে একই রকম সম্পর্ক রাখার ভারতের যে নীতি তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুফল দিলেও সবক্ষেত্রে তা ফলদায়ী হতে পারে না, চীন ভারত সম্পর্ক তা প্রমাণ করে।

প্রতিবেশী দেশ হিসেবে পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের কাছে এক মূর্তিমান বিভীষিকাস্বরূপ। ভারতের জন্য তার একমাত্র বিদেশ নীতি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে অস্থির রাখা এবং সীমান্তে গোলাগুলি চালিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সারা বছর ব্যস্ত রাখা। এর ব্যত্যয় কখনোই ঘটেনি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে। কখনো কখনো সীমান্তের গোলাগুলি বন্ধ থাকলেও পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদি গোষ্ঠীগুলো ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানো থেমে থাকে না। লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-এ মহম্মদ, হিজবুল মুজাহিদিন ইত্যাদি গোষ্ঠীগুলির জেহাদি তৈরির আঁতুড়ঘর পাকিস্তানে অবস্থিত। তাদের একমাত্র লক্ষ্য সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কাশ্মীরকে ভারতের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং জেহাদি ভাবধারা পাচারের মাধ্যমে ভারতকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তোলা। পাকিস্তানের এই চরম ভারত বিরোধী বিদেশ নীতির উদগাতা ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক। জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে সরিয়ে শাসনভার হাতে নেন এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের মতো দেশগুলির বিরুদ্ধে পরোক্ষ যুদ্ধ শুরু করেন।

পাকিস্তানি সমাজের ইসলামীকরণের কাজটা তিনিই সম্পূর্ণ করেন। যে কারণে আজ পাকিস্তানে উগ্রপন্থী তৈরির কারখানাগুলো নিশ্চিন্তে চলতে পারছে। সমাজ থেকে এর জন্য কোনো প্রতিবাদ হয় না। ফলত নির্বাচনের সময় দেখা যায় ভারত বিরোধী জিগির না তুললে, কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিলে কোনো রাজনৈতিক দলই পাকিস্তানিদের মন জয় করতে পারে না। পাকিস্তানি সমাজ বর্তমানে প্রায় পুরোপুরি মোল্লাবাদী। স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, গণতান্ত্রিক ভারতের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এক আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় না বসার জন্য যে জেদ, সমালোচকরা অনেকেই সেটাকে পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের অন্তরায় বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত নরম মানসিকতার প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের দশবছরের সময়কালের উল্লেখ প্রয়োজন। সেই সময় পার্লামেন্টে আক্রমণ হয়, মুম্বাইয়ে ইসলামি জেহাদিরা হত্যা কাণ্ড চালায় যা ভারতের ইতিহাসে কুখ্যাত ২৬/১১ নামে পরিচিত।

প্রতিক্রিয়ারহিত তদানীন্তন ভারত সরকারের সহনশীল মানসিকতার কোনো সুফল সেদিন আমরা পাইনি। বরং বিগত ১০ বছরের শাসনকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের কট্টর বিদেশ নীতির দ্বারা প্রমাণ করেছেন— পাকিস্তানের জন্য টিট ফর ট্যাট নীতিই উপযুক্ত। পাকিস্তানি মদতে কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে আধা সামরিক বাহিনীর প্লাটুন আক্রান্ত হলে তার বদলা নেওয়া হয়। ভারতের এই নীতির জন্য পাকিস্তান বর্তমানে আর ততটা আক্রমণাত্মক নীতি নিতে পারে না। আমরা সাধারণ ভারতবাসী দেখেছি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজীর পাকিস্তান সফরকালে সেখানকার আর্মি জেনারেল মুশারফ কীভাবে ভারত আক্রমণের নকশা বানিয়েছে এবং ভারতের উপর কারগিল যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। অধুনা আপামর ভারতবাসী তাই ভারতীয় প্রশাসন দ্বারা গৃহীত পাকিস্তানের জন্য এই বিদেশ নীতিকে প্রাণ খুলে সমর্থন করেন।

বর্তমান ভারত সরকার তাই তার ছোটো বড়ো প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য কোনো সাধারণ ও সুসামঞ্জস্য বিদেশনীতি প্রণয়ন করে না। আন্তর্জাতিক কূটনীতির মূল কথা— কোনো দেশ চিরকালীন শত্রু নয়, আবার কোনো দেশ চিরকালীন মিত্র থাকতে নাও পারে। মূলত এই নীতিকে কেন্দ্র করে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত অবস্থানের প্রেক্ষিতে বিদেশ নীতির এই সঞ্চরণশীলতা বাস্তবানুগ। বিগতদিনে পরমাণু শক্তিধর পাকিস্তানের জন্য ভারতের বিদেশ নীতির যে দুর্বলতা ছিল আজকে তার অনেকটাই দূরীভূত হয়েছে। বর্তমানে দেশ আর বলে না— আমরা কখনো, কোনো পরিস্থিতিতেই

আগে থেকে কোনো দেশের উপর পরমাণু আক্রমণ হানবো না। ১৪০ কোটির দেশ মিউমিউ করবে, বিশ্বে সফ্ট স্টেট হিসেবে পরিচিতি পাবে, এ হতে পারে না। আগ্রাসনকে ঠেকাতে গেলে আগ্রাসী মনোভাব প্রয়োজন, দেরিতে হলেও দেশ বুঝেছে, এটাই মঙ্গলের। আজকের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য, সমরবিদ্যা প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে কয়েকশো যোজন পিছিয়ে পড়েছে। দেরিতে হলেও পাকিস্তানের বর্তমান প্রশাসকরা এটা বুঝেছেন এবং প্রকাশ্যে সেই স্বীকারোক্তিও দিয়েছেন যে, আমরা বৃথাই ৭৫ বছর ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করে নিজেদের পিছিয়ে দিয়েছি। লাভের লাভ কিছু হয়নি। আর সময় নষ্ট করতে চাই না। এটা পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উদয় নাকি চালাকি সেটা আগামীদিনই বলবে।

কোনো গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তার প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক দেশের সম্পর্ক নির্ভর করে দেশ দুটির নির্বাচিত সরকারের প্রধান এবং সরকারি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের উপর। পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের কোর ইডিওলজি যেহেতু ভারত বিরোধিতা তাই পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ভারত বিরোধী- বিদেশ নীতির প্রাবল্য সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা হয় না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো না থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মোটের উপর কখনোই ততখানি খারাপ নয় বা ছিল না। একাত্তরের পর এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সময়কালে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের শীতলতা তৈরি হয়। এরশাদ ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক এবং এক কট্টর ইসলামপন্থী প্রশাসক। তিনি সংবিধান পালটে বাংলাদেশকে ইসলামি দেশ হিসেবে ঘোষণা দেন। আর খালেদা জিয়া বাংলাদেশের জেহাদি সংগঠন জামাতে ইসলামির সমর্থনে সরকার পরিচালনা করতেন। যে কারণে তার বাধ্যবাধকতাতেই ছিল ভারত বিরোধিতা।

বেগম জিয়া সরকারের পতনের পর দীর্ঘকাল বাংলাদেশ শাসন করেন মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। ঐতিহাসিকভাবেই তার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক ছিল। দেশকে স্বাধীন করার লড়াইয়ে ভারতের সহযোগিতাকে তিনি সবসময়ই বিশ্বের সমস্ত মঞ্চে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন। কখনোই তিনি সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, দেশের স্বতন্ত্রতা বিরোধী রাজাকারদের বাড়তে দেননি। তাদের বিচারের আওতায় এনে অনেককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। কিন্তু দেশের মৌলবি, উলেমা, হুজুরদের নিরন্তর ভারত বিরোধিতা এবং জামাতে ইসলামি, হেফাজতে ইসলাম প্রভৃতি মোল্লাবাদী সংগঠনের বাড়বাড়ন্তের ফলে গত জুলাই মাসে সেখানে জেহাদি অভ্যুত্থান ঘটে এবং দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়িত করা হয়। শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. ইউনুস সে দেশের প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু দেশে শান্তিশৃঙ্খলা এখনো ফেরেনি। ইউনুস সাহেব এখন বুঝছেন যে, ক্ষমতায় না থেকে ভারত বিরোধিতা করা যতখানি সহজ, ক্ষমতায় এসে ভারতের বিরোধিতা করা, ভারত বিরোধী গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া ততটা সহজ নয়। ভারতের সহযোগিতা ছাড়া যে এক পাও চলা যাবে না, সেটা তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক চেয়ে অনুরোধ জানিছেন।

মনে রাখতে হবে, দেশের প্রধান পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে এই ইউনুস সাহেবই ধমকি দিয়েছিলেন--- ভারতের সেভেন সিস্টারস্‌কে (অসম-সহ ভারতের পূর্ব ক্ষেত্রের সাতটি পাহাড়ি রাজ্য) অস্থির করে তোলা হবে। তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারতকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ব্যাপারখানা ততটা সহজ হবে না, কারণ চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো রকমের ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। তিনদিকে ভারত এবং একদিকে ভারত মহাসাগর বেষ্টিত বাংলাদেশ। তাই ভারত বিরোধী বিদেশনীতি নিয়ে বেশি দূর এগোতে পারে না। এটা তাদের বুঝতে হবে। বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। পৃথিবীর ২৫ শতাংশ জমি নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত কিন্তু জনসংখ্যায় পৃথিবীর প্রায় আড়াই শতাংশ। ওইটুকু দেশে সাড়ে ১৭ কোটি মানুষের বসবাস, মানুষ গিজগিজ করছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থান রুটি রুজির ব্যবস্থা দেশকে করতে হবে। যে কোনো সরকারের কাছে এ এক পাহাড় প্রমাণ কাজ। অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়া সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর সেটার জন্য প্রয়োজন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করা। আরেকটি বিষয় বাংলাদেশের জনগণ ও প্রশাসন ভাবতে পারে। দেশে কোনো রকমের সামরিক বাহিনী

ভারত তার ছোটো বড়ো সমস্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী। কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিবেশী দেশেরও সেভাবেই এগিয়ে আসা উচিত। তা যদি না হয়, সেক্ষেত্রে ভারতকেও অনুরূপ আচরণ করতে হবে এবং বার্তা দিতে হবে যে, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখলেই তারা আর্থিক ছাড়াও নানান ভাবে উপকৃত হতে পারে, অন্যথা নয়।

সকলকে আমন্ত্রণ

আগামী ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবনের 'রামকৃষ্ণ হল'-এ দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

এই উপলক্ষ্যে 'জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্টে'র পক্ষ থেকে সকল জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমী মানুষকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

স্থান : রামকৃষ্ণ হল
স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবন (দ্বিতল)
১০৫, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬
যোগাযোগ : 9123667710, 9748761266

থাকবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শুধুমাত্র পুলিশবাহিনী আর সীমান্তে থাকবে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিডিআর। বিদেশি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ভারতের সঙ্গে সামরিক চুক্তি থাকবে। এতে দেশের সামরিক ক্ষেত্রে যে ব্যয় সেটা বাঁচবে এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরী হবে।

ভারত তার ছোটো বড়ো সমস্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী। কিন্তু সেই সমস্ত প্রতিবেশী দেশেরও সেভাবেই এগিয়ে আসা উচিত। তা যদি না হয়, সেক্ষেত্রে ভারতকেও অনুরূপ আচরণ করতে হবে এবং বার্তা দিতে হবে যে, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখলেই তারা আর্থিক ছাড়াও নানান ভাবে উপকৃত হতে পারে, অন্যথা নয়। করোনা অতিমারির সময় ভারত সরকার বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন পাঠিয়ে এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশিদের একটা বড়ো অংশ সেটা মনে রাখেনি। বর্তমান বাংলাদেশি যুব সমাজ ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেনি। স্বাভাবিকভাবেই তারা দেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা অবদান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত নয়। কিন্তু করোনাকালের সহযোগিতা তো সেদিনের ঘটনা। কট্টরবাদী মোল্লা মৌলবিরাও তো এতে উপকৃত হয়েছে। আসলে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর মধ্যে কট্টরবাদের সম্প্রসারণের ফলে এই ভারত বিরোধী জিগীর। বাংলাদেশিদের মধ্যে ভারতীয় পণ্য বয়কট আন্দোলন তারই ফল। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' বিদেশনীতি খুব কার্যকরী ও সময়োপযোগী। ভারতের সহযোগিতা কতখানি অপরিহার্য তা তাদের বোঝানোর প্রয়োজন আছে। এরপরেও তারা ভারত বিরোধী লাইন নিলে ভারতের উপযুক্ত বিদেশ নীতি হবে— শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

ভারতের উত্তরে পার্বত্য দেশ নেপাল। চিরাচরিতভাবেই নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রগাঢ়। ইতিহাসের ষোড়শ মহাজনপদের আমলে নেপালের নাম ছিল বিরাট রাজ্য। অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব সেখানেও গিয়েছিলেন। ধর্ম ও সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগতভাবে ভারত ও নেপালকে আলাদা করা যায় না। দীর্ঘদিন নেপাল বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে আমাদের মতোই নেপালে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রীই সেখানে দেশের পরিচালক। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। বহুদলীয় গণতন্ত্র নেপালে মূলত প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল ঘুরে ফিরে ক্ষমতায় আসে। নেপালি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মা লে) কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল মাওইস্ট সেন্টার)। বর্তমান বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে নেপালের সুসম্পর্ক থাকারই কথা, সেটাই স্বাভাবিক। শের বাহাদুর দেওবা এবং পুষ্পকুমার দহল (প্রচণ্ড)-এর সময়ে এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার চীন প্রীতির জন্য বিশেষ পরিচিত। তিনি ভারতের উত্তরাখণ্ডের কিছু জায়গাকে নেপালের বৃহৎ মানচিত্রের মধ্যে দেখিয়েছেন এবং চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে ভারতকে চাপে রাখতে চান। নেপাল একটি স্থলভাগ বেষ্টিত দেশ, স্থলপথেই বাণিজ্য হয় এবং বাণিজ্যের প্রধান পথ হচ্ছে ভারত। নেপাল বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য চালায় মূলত ভারতের হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে। নেপাল, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কার মতো ভারতের ছোটো প্রতিবেশী দেশগুলো আসলে আমেরিকা ও চীন প্রীতি দেখিয়ে ভারতকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর (২০১৪ সালে) প্রথম বিদেশ ভ্রমণ ছিল নেপালে। সেই মর্যাদা নেপাল রাখেনি। একই কথা খাটে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের ক্ষেত্রেও। মালদ্বীপের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মৈজ্জু শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য চরম ভারত বিরোধিতার অস্ত্র হাতে তুলে নেয় এবং ক্ষমতা লাভের পর দেশ থেকে ভারতীয় সেনাকে সরিয়ে দেয়। পরিবর্তে চীনের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়। মালদ্বীপের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে ট্যুরিজম এবং পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় ভারতীয় টুরিস্টদের নিকটতম এবং অন্যতম প্রধান গন্তব্য হচ্ছে মালদ্বীপ। ভারত ভ্রমণ পিপাসুরা সারা বছরই সেখানে যায়। দেশীয় অর্থনীতির ভিত নষ্ট করে চীনের থেকে ঋণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এ কোনো মতেই সম্ভব নয়। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে তারা এটা অন্তত বুঝতে পেরেছে। যে কারণে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের ভ্রান্তি দূর হয়েছে এবং দেশের প্রধান মৈজ্জু সাহেব পুনরায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

আর্থ-বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক, কারণে কোনো দেশের সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশের সুসম্পর্ক থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এতে রয়েছে কূটনৈতিক বাস্তবতা। ইজরায়েলের সঙ্গে আরব দেশগুলো লড়াই ধর্মীয় কারণে এবং রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের লড়াই রাজনৈতিক কারণে। অনুরূপভাবে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের লড়াইয়ের প্রধান কারণ ধর্মীয়, যেখানে ভারত-নেপাল সম্পর্কের শীতলতা রাজনৈতিক কারণে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন। কিন্তু সে দেশের মোল্লাবাদী জেহাদি মানুষরা তা ভালোভাবে নেয়নি। আর তার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্মীয়, ভারত হিন্দুর দেশ।

রাজনৈতিক কারণে নেপালের প্রধানমন্ত্রী অলি ভারত বিরোধী হলেও নেপালের জনগণের ভারতীয়দের প্রতি অসূয়া নেই। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কিন্তু মুসলমান প্রধান মালদ্বীপের ক্ষেত্রে তা খাটে না। দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের ব্যগ্রতায় দেশীয় জনগণের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা তৈরি করেন। নির্বাচনে তার সুফল কুড়োয় এবং ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর পড়ে সমস্যায়। বাংলাদেশের ইউনুস এবং মালদ্বীপের মৈজ্জু সাহেবের বিড়ম্বনা এটাই। □

শোক সংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার কসবা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক দিলীপ কুমার দে গত ১১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। কিশোর বয়সে তিনি স্বয়ংসেবক হন। সঙ্ঘের দ্বিতীয়বর্ষ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে সঙ্ঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর পুত্র সন্দীপ কুমার দে বর্তমানে কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ সেবাপ্রমুখের দায়িত্বে রয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশে পাওয়া গেল একাধিক মন্দিরের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে ৪৪ বছর পরে খুলে গিয়েছে একটি মন্দির। ভিতরে পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন দেবমূর্তি। মন্দিরগাত্রে মিলেছে মোরাদাবাদ দাঙ্গার সময়কালীন মন্দির আক্রমণের চিহ্ন। আবার গাজিয়াবাদের একটি স্থানে বজ্রপাতের পর একটি শিবলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মোরাদাবাদের গৌরীশঙ্কর মন্দিরটি ১৯৮০ সালে দাঙ্গার সময়ে হয়েছিল বিধ্বস্ত এবং আংশিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। মন্দিরটিকে আক্রমণ করে মন্দিরের পুরোহিতকে নৃশংসভাবে হত্যা করে জেহাদিরা। সেই সময় থেকেই মন্দিরটি ছিল বন্ধ। সম্প্রতি সেখানে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয় শিবলিঙ্গ-সহ নন্দী ও শ্রীহনুমানের মূর্তি। গাজিয়াবাদের মসুরি থানা এলাকায় মুবারিকপুর-ডাসনা গ্রামের একটি মাঠের মধ্যে হঠাৎ করে একটি ভারী বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতের ফলে মাঠের মধ্যে ১০-১২ ফুট গভীর একটি গর্ত সৃষ্টি হয়। সেখানে সন্ধান মেলে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গের। সম্ভল, বদায়ুন, আলিগড়, মোদীনগরের পর উত্তরপ্রদেশের এই গ্রাম সাক্ষী

থাকল প্রকৃতির অদ্ভুত লীলার। চাপা পড়া মাটির স্তর ভেদ করে যেন বেরিয়ে এলো প্রাচীন ইতিহাস। শিবলিঙ্গ গাত্রে বিভূতি দ্বারা অঙ্কিত ত্রিপুণ্ড্রের চিহ্নটিও ছিল বিদ্যমান। উদ্ধারের পর স্থানীয় মানুষ নিকটবর্তী একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গটিকে স্থানান্তরিত করে এবং যেস্থানে শিবলিঙ্গটি প্রকট হয় সেখানে একটি মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

আমেরিকায় জেহাদি হামলা : মৃত ১৫, আহত ৩৫

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইংরেজি নতুন বছর উদ্‌যাপনের দিন আমেরিকায় ঘটল জেহাদি হামলা। আমেরিকার লুইজিয়ানা প্রদেশে মিসিসিপি নদীর তীরে অবস্থিত নিউ অরলিয়েন্স শহরে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল গাড়ি। চলে এলোপাথারি গুলিও। স্থানীয় সময় অনুযায়ী গত ১ জানুয়ারি ভোরে গাড়ির ধাক্কায় এবং চাকায় পিষ্ট হয়ে অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদসূত্রের খবর। মারাত্মক জখম অন্তত ৩৫ জন। শহরের মেয়র ইচ্ছাকৃত গাড়ি হামলার এই ঘটনাকে 'জঙ্গি হামলা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। বুরবোঁ স্ট্রিট নামক জনবহুল একটি রাস্তায় ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মানুষ নতুন বছরের উৎসব উদ্‌যাপন করছিলেন। সে সময় ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে জনতাকে পিষে দেয় দ্রুতগতির একটি গাড়ি। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্ততপক্ষে ১৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অ্যানি ক্রিকপ্যাট্রিক নামে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সাদা রঙের পিক-আপ ট্রাক চালক যত বেশি সম্ভব মানুষকে ধাক্কা দিতে চাইছিল, তার ফলে এতজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। ঘটনার পরেই পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ওই গাড়ি চালকের। তার নাম সামসুদ্দিন জব্বর (৪২)। টেক্সাসের বাসিন্দা, প্রাক্তন মার্কিন সেনাকর্মী জব্বর পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বলে সংবাদসূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন ভোর ৩.১৫-য় ট্রাক চালিয়ে লোকজনকে পিষে দেওয়ার পর একটি অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে গাড়ি থেকে নেমে আসে জব্বর। তার পোশাকে গোঁজা ছিল নানা অস্ত্রশস্ত্র। জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে এই জেহাদি। তার সঙ্গে গুলি বিনিময় শুরু হয় স্থানীয় পুলিশের। দু'জন পুলিশ অফিসার তার ছোঁড়া গুলিতে আহত হন। জব্বর চালিত ট্রাকটির পিছনদিকে ছিল একটি কালো রঙের ইসলামিক স্টেটের (আইসিস) পতাকা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকার্ত পরিবারগুলির উদ্দেশে তাঁর এক্স-হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জেহাদি হামলায় আক্রান্ত নিউ অরলিয়েন্সের মানুষ এবং শোকস্তব্ধ পরিবারগুলির পাশে তিনি রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষমতাসীন হলে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে এবং এই হামলার পিছনে থাকা অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে বলে তিনি এই ট্যুইটে জানিয়েছেন।

দিল্লিতে বীর সাভারকর কলেজের শিলান্যাস-সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দিল্লিতে বীর সাভারকর কলেজ এবং অনেকগুলি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ৩ জানুয়ারি প্রকল্পগুলির উদ্বোধন কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আজ হলো দিল্লির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি দিন। আজকের দিনেই আবাসন, পরিকাঠামো এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির শুভ সূচনা হচ্ছে, যা দিল্লির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি আগামীদিনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির সম্পূর্ণ রূপান্তরে সহায়ক হবে।’

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘সকলের জন্য বাসস্থান’ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন ঘটিয়ে এইদিন দিল্লির অশোক বিহার-স্থিত স্বাভিমান অ্যাপার্টমেন্টসের ১,৬৭৫টি নবনির্মিত ফ্ল্যাটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য এই ফ্ল্যাটগুলি নির্মিত হয়েছে। আবাসন প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে স্থায়ী বাসস্থান পেতে চলেছে অনেকগুলি পরিবার। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এক একটি ফ্ল্যাট নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। নির্মাণ ব্যয়ের সাত শতাংশের কম অর্থ জমা করতে হবে ফ্ল্যাট প্রাপকদের। আর্থিকভাবে অনগ্রসর পরিবারগুলিকে দিতে হচ্ছে ফ্ল্যাট নির্মাণ বাবদ ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য ফ্ল্যাটগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৩০ হাজার টাকা। আবাসন প্রকল্প উদ্বোধনের এই অনুষ্ঠানে ফ্ল্যাট প্রাপকদের হাতে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রকল্পটি উদ্বোধনের পর কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। জিপিআরএ টাইপ-২ কোয়ার্টার্স এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, নৌরজী নগর তার মধ্যে অন্যতম। ৬০০টি পুরনো কোয়ার্টারের পরিবর্তে নবরূপে আবির্ভূত এই ট্রেড সেন্টারটিতে থাকছে অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন একাধিক বাণিজ্যিক টাওয়ার। বাণিজ্যকেন্দ্রের এই টাওয়ারগুলির মাধ্যমে হতে চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ৩৪ লক্ষ বর্গফুট জায়গার সংস্থান। ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট (বর্জ্য জল শোধন)-এর মাধ্যমে জিরো লিক্যুইড ডিসচার্জ, সোলার-এনার্জি জেনারেশন (সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন), রেনওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম (বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা)-সহ একাধিক অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা এই টাওয়ারগুলিতে রয়েছে। দিল্লির সরোজিনী নগরে নির্মিত হয়েছে জিপিআরএ টাইপ-২ কোয়ার্টার্স, যার মধ্যে রয়েছে ২৮টি টাওয়ার। এই আবাসন প্রকল্পটিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা-সহ ২,৫০০-এরও বেশি রেসিডেন্সিয়াল ইউনিট রয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের বাসস্থানের জন্য নির্মিত পরিবেশ-বান্ধব এই আবাসন প্রকল্পটিতে সৌরবিদ্যুৎ চালিত ওয়েস্ট কমপ্যাক্টর, নিকাশি এবং জল শোধন প্ল্যান্ট।

উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামো উন্নয়নে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনটি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। মোট প্রকল্প ব্যয় হতে চলেছে ৬০০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে দ্বারকায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সিবিএসই-ইন্টিগ্রেটেড অফিস কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ইন্ডিয়ান গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল (আইজিবিসি)-এর প্ল্যাটিনাম রেটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে এই কার্যালয়টি নির্মিত হয়েছে। এই কার্যালয়টিতে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিশিষ্ট অসংখ্য অফিস-সহ রয়েছে একটি অডিটোরিয়াম (সভাঘর) ও একটি অ্যাডভান্সড্ ডেটা সেন্টার। নজফগড়-স্থিত রোশনপুরার বীর সাভারকর কলেজের শিলান্যাসও এদিন করেন প্রধানমন্ত্রী। ১৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে, ১৮,৮১৬.৫৬ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে নির্মিত হতে চলেছে বীর সাভারকর কলেজ। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মীয়মাণ ওয়েস্ট ক্যাম্পাস নামক অ্যাকাডেমিক ব্লক এবং আরবান এক্সটেনশন রোড হাইওয়ের নিকটে এই কলেজটি নির্মিত হতে চলেছে। কলেজটিতে থাকবে ২৪টি ক্লাসরুম (শ্রেণীকক্ষ), ৪০টি ফ্যাকাল্টি রুম, কনফারেন্স রুম, ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম ও লাইব্রেরি।

বাংলাদেশে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশের নড়াইল সদর উপজেলায় সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য, হিন্দু নারী বাসনা মল্লিক (৫০)-এর সম্ভ্রমহানি করে একদল হিংস্র জেহাদি। তাঁর উপরে ভয়ংকর নির্যাতন চালানার পর তাঁর মুখে বিষ ঢেলে দেয় এই জেহাদিরা। ঘটনার দু'দিন পর যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৬ ডিসেম্বর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্ত শেষে গত ২৭ ডিসেম্বর তাঁর মরদেহ নড়াইলে গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। মৃতার পরিবার জানিয়েছে যে গত ২৪ ডিসেম্বর রাজিবুল-সহ কয়েকজন জেহাদি তাঁর উপর যৌন নির্যাতন চালায় এবং তাঁকে জোর করে বিষপান করায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে সীমু মোহন্ত নামে এক হিন্দু যুবতীকে অপহরণ করে জেহাদিরা। তাঁর সম্ভ্রমহানি করে তাঁকে ইসলাম গ্রহণে জেহাদিরা বাধ্য করেছে বলে সংবাদসূত্রের খবর।